# দর্পন

শারদীয় সংখ্যা, ১৩৯১

- ভরতুকী-নির্ভর পুঁজিতন্ত্র ঃ ভারতে পুঁজিবাদের নতুন রূপ
- জহরলাল নেহরুর উন্নয়ন পরিকল্পনার জন্মরহস্য
- স্বৈরতন্ত্রের বিরুদ্ধে সংগ্রাম

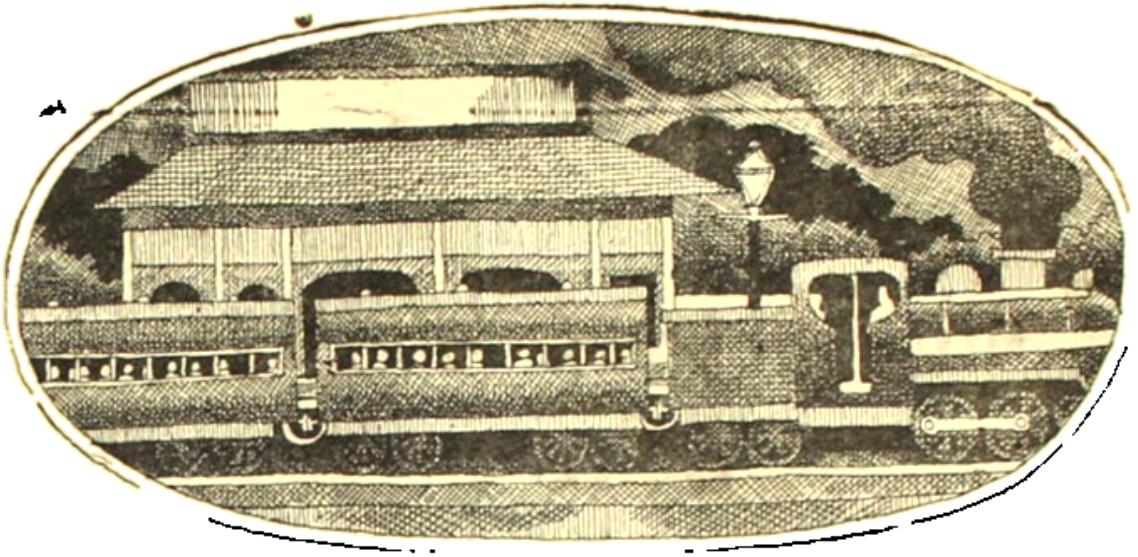

"ভবানীপুরের তেতলা বাড়িতে
আলাপ চলছে সরু মোটা গলায় —
এবার এবু পাহাড়ে না মাদুরা,
না ডালহৌসি কিম্বা পুরী,
না সেই চিরকেলে চেনা লোকের দার্জিলিঙ ?।"

যেখানেই যান না কেন,
আপনাদের যাত্রা শুভ হোক।

পূর্ব রেলওয়ে

# শারদীয়া লেখক সম্মাবেশ ১৩৯১

প্রবন্ধ

নারায়ণ চৌধুরী। আহমদ শরীফ। পরেশ রায়। বিজেন্দ্রলাল নাথ। রশীদ আল কারুকী। অলোক চট্টোপাধ্যায়। জয়ন্তী চট্টোপাধ্যায়। দীপক ভট্টাচার্য।

গল্প ও অনুবাদ গল্প

মিহির আচার্য। দীপকের দাস। নিরঞ্জন দেওয়ান। জমেন চক্রবর্তী। মতি মুখোপাধ্যায়। সমরেশ দাশগুপ্ত। নির্ঝরিণী দেবরায়। বরুনী মন্ডল। বরেণ্য ভট্টাচার্য।

বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। শংকরানন্দ মুখোপাধ্যায়। বীরেন্দ্র গুপ্ত। সমীর রায়। সরোজলাল বন্দ্যোপাধ্যায়। সাগর চক্রবর্তী। গোবিন্দ হালদার। মুহাম্মদ নুরুল হুদা। শশিভূষণ মিত্র। মোঃ আকন্দ মিয়া চৌধুরী। সুমিত চট্টোপাধ্যায়। সুব্রত পাল। মনোজ নন্দী। দীপ্তিময় সরকার। আলি কদর আল জামান।

নাটক

ল্যাংস্টনহিউজ। ব্রজেন মজুমদার।

কবিতাগুচ্ছ

মহালয়ার পূর্বেই প্রকাশিত হবে

*দাম আট টাকা*

কামালিয়া ॥ ১৭২/৩৫ আচার্য জগদীশ বসু রোড। কলকাতা-১৪

# দর্পণ

শারদীয় সংখ্যা, ১৩৯১

## সূচীপত্র


| | |
|---|---|
| ভরতুকী-নির্ভর পুঁজিতন্ত্র : ভারতে পুঁজিবাদের নতুন রূপ / সুভাষচন্দ্র সরকার | ১ |
| হে আমার পৃথিবী আমার স্বদেশ / রণজিৎকুমার সেন | ১১ |
| জাতীয় সংহতির সমস্যা ও উত্তরণের পথ / বৈদ্যনাথ সাহা | ১৬ |
| স্বৈরতন্ত্রের বিরুদ্ধে সংগ্রাম / নারায়ণ চৌধুরী | ২৫ |
| ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের গতিপ্রকৃতি / তিনির বসু | ৩২ |
| জহরলাল নেহরুর উন্নয়ন পরিকল্পনার জন্মরহস্য / রণজিৎ রায় | ৪০ |
| জনস্বার্থ সংক্রান্ত মামলা / অরুণপ্রকাশ চট্টোপাধ্যায় | ৬০ |
| পাইয়ে-দেওয়ার রাজনীতির পাল্টা / শ্রীপতি নন্দী | ৬৫ |
| মৃণাল সেন এখন ভরতরূপ : সমর বন্দ্যোপাধ্যায় | ৬৮ |
| পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক ও সামাজিক চিত্র / ফণী চক্রবর্তী | ৭১ |

# যে সৌন্দর্য চিরদিনের

কিছু কিছু জিনিষ রয়েছে যা আমাদের চিরকালের সম্পদ। বাংলার তাঁত বস্ত্র ও হস্তশিল্প কালের করালগ্রাস উপেক্ষা করে আমাদের চিরকালের সম্পদে পরিণত হয়েছে। এ আমাদের একান্ত নিজস্ব এবং গর্বের বস্তু।

বাংলার শাড়ি, শিল্প রূপের মতই এর হস্তশিল্পজাত সামগ্রীতে রয়েছে ঘরের ছোঁয়া গৃহসজ্জার উপকরণ থেকে শুরু গয়না, কাঁধে নেবার ব্যাগ, মাদুর, তাঁতের শাড়ি এমন কি শার্ট ও প্যান্টের কাপড়—সবেতেই রয়েছে নিপুণ শিল্পীদের প্রাণময় শিল্পবোধের স্পর্শ।

সময় এই ঐতিহ্যকে ম্লান করতে পারেনি।

নিজে বাছাই করবার জন্য আসুন 'তন্তুজ' বা 'তন্তুশ্রী'-তে। এখানে পাবেন তাঁতজাত বস্ত্রাদি। হস্তশিল্পজাত সামগ্রীর জন্য আসুন 'মঞ্জুষা' অথবা গ্রামীণ শিল্প বিপণিগুলিতে।

P 29656

॥ পশ্চিমবঙ্গ সরকার ॥

—তথ্য ও সংস্কৃতি ৭৬৬৭/৮৫

দর্পণ

শারদীয় সংখ্যা, ১৩৯১

# ভরতুকী-নির্ভর পুঁজিতন্ত্র ঃ ভারতে পুঁজিবাদের নতুন রূপ

সুভাষচন্দ্র সরকার

গত শারদীয় সংখ্যায় এই পত্রিকায় বাঙ্গালী হয়ে বাঁচার সমস্যা সম্পর্কে লিখেছিলাম। সে প্রবন্ধ কেউ পড়েছিলেন কিনা জানিনা। তবে গত এক বছরের মধ্যে এই সমস্যা আরও তীব্র হয়েছে। কয়েক সপ্তাহ পূর্বে বাঙ্গালীর বাসভূমি পশ্চিমবঙ্গে নব নির্বাচিত হাওড়া পুরসভার সদস্যদের বাংলাতে শপথ গ্রহণ করতে দেওয়া হয়নি। আনন্দবাজার পত্রিকাতে দেখলাম যে কংগ্রেস-ই এর প্রতিবাদ করেছিল। এ ঘটনা থেকেই বোঝা যায় ক্ষমতার বাইরে থাকলে রাজনৈতিক দলের কত উন্নতি হয়। স্বাধীনতার অব্যবহিত পর প্রায় দুই দশক যাবত কংগ্রেস পশ্চিমবঙ্গে নিরঙ্কুশ শাসন চালিয়েছে। ক্ষমতায় থাকার সময় যদি কংগ্রেস সদস্যরা পশ্চিমবাংলার বাংলা ভাষার সংরক্ষণ, উন্নতি ও প্রসারে মনোযোগী হতেন আংশিকভাবেও, তাহলেও আজ স্বাধীনতা লাভের ৩৭ বছর পর ১৯৮৪ সালে পশ্চিমবাংলার (হাওড়া জেলার মহকুমা শাসক) বাঙ্গালী সরকারী কর্মচারীকে বাংলাতে শপথ পাঠে বাধা দিতে দেখা যেত না। বিলম্বে হলেও যে পশ্চিম-বাংলার কংগ্রেসী সদস্যরা নিজের দলের নীতি ও কর্ম-পন্থার দুর্বলতাগুলি বুঝতে আরম্ভ করেছেন তা শুভ লক্ষণ। কিন্তু সরকারে ক্ষমতাসীন দলের (সবই প্রায় সি পি এমের সদস্য) পর প্রতিনিধিরাও কেন মহকুমা শাসকের এই অযৌক্তিক বিধান মেনে নিলেন তা বুঝতে পারলাম না। সদস্যরা মহকুমা শাসকের সভাস্থল থেকে বের করার হুমকির সামনে কথা বোয়ালেন কি করে? সকলে মিলে বাংলার শপথ নিলে মহকুমা শাসক কি করতেন? আর যদি মহকুমা শাসক শেষ পর্যন্ত তাঁর অন্যায়ে জিদ নিয়েই থাকতেন তবে সি পি এম কংগ্রেস মিলে মুখ্যমন্ত্রীকে কেন অনুরোধ করেন নি অর্ডিন্যান্স জারী করে বাংলার প্রতি এই অসম্মাননা দূর করতে? কোন দলের সরকার থাকার অর্থ কি যদি সেই দল জনসাধারণের সুবিধার্থে সরকারী ক্ষমতা ও আইন ব্যবহার না করে? আমি নিতান্ত দুঃখিত যে পশ্চিমবাংলার রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ এইরূপ একটি জাতীয় প্রশ্নের উত্তর খোঁজার জন্যও সম্মিলিত প্রচেষ্টার কথা ভাবেন না। ক্ষমতায় এসে সি পি এম এখন কিছু করেনি যাতে মনে হতে পারে যে এই সরকার দুষ্কর্মকারী কংগ্রেস সরকার থেকে খুব বেশী আলাদা। দু একটি বিষয়েও সি পি এম কংগ্রেস সম্মিলিত প্রচেষ্টা করলে জনমানসে সেইটুকু পার্থক্যও দূর হয়ে যাবে এই যদি চিন্তাধারার গতি হয় তবে অবশ্য আমার আর বলার কিছু নেই—নিজের মানসিক ক্ষোভ এবং লজ্জা প্রকাশ করা ছাড়া বাংলাভাষার এই অবমাননার জন্য।

হাওড়ার বাঙ্গালী মহকুমা শাসক প্রমাণ করেছেন তাঁর মানসিক ক্ষমতার অপ্রতুলতার। অন্ধ্রপ্রদেশে সম্প্রতি যে লজ্জাজনক দুঃখদায়ক রাজনৈতিক ঘটনা ঘটলো—নির্বাচিত রাও রাও মন্ত্রিসভাকে অবৈধভাবে ভেঙ্গে দেওয়ার—তার

মধ্য থেকেও একটি ঘটনা ইচ্ছে করে ব্যতিক্রম এই দৃষ্টান্তের ঘটনাবলীর। তা হল মুখ্যমন্ত্রীরূপে তাঁকর রাওএর তেলেগু ভাষায় শপথ গ্রহণ। পশ্চিমবাংলা যেমন ব্রিটিশ কৃত আইনে চলে অন্ধ্রপ্রদেশও তাই। যদি কোন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মাতৃভাষায় কর্মভার গ্রহণের শপথ নিতে পারেন তাহলে কি পুরসভার সদস্যরা মাতৃভাষায় শপথ নিতে পারেন না? পুরসভার সকল সদস্য বা অধিকাংশ সদস্য বাংলাতে শপথ নিলে কি মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে যেত? কিন্তু আরও লজ্জার কথা হাওড়া মহকুমা শাসকের এই অপকীর্তির বিরুদ্ধে গণ-আন্দোলন গড়ে উঠলো না পশ্চিমবঙ্গে।

ঠিক একই গোত্রের অন্যায় সিদ্ধান্তের শিকার হয়েছেন বাঙ্গালী অধ্যাপক, যাঁর গবিতসাপ্ত সম্পর্কিত পি এইচ ডি ডিগ্রীর থিসিস গ্রাহ্য হয়েছে—নিশ্চয়মনের জন্য নয়—বাংলাভাষাতে লেখা হওয়ার দরুন। যে বিশ্ববিদ্যালয় এই অপকীর্তির পটভূমি তা স্বাধীনতার পরবর্তী কালে বাঙ্গালীদের সরকারের বানানো; ব্রিটিশের বানানো নয় (দুর্ভাগ্যবশতঃ)। ব্রিটিশের বানানো নয় তাকে দুর্ভাগ্যজনক বলছি এ কারণে যে ব্রিটিশ প্রবর্তিত আইনে ন্যায়বিচার পাওয়া একেবারে অসম্ভব ছিল না। স্বাধীনতা প্রাপ্তির দশ বছর আগে যখন অবিভক্ত বাংলাদেশে ব্রিটিশ সরকার তান্ডবের রাজত্ব চালিয়ে যাচ্ছিলেন সেই সরকারের তীব্র বাঙ্গালী বিরোধী যুগেও একজন বাঙ্গালী ছাত্রের পক্ষে বাংলায় পি এইচ ডি থিসিস লিখে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পি এইচ ডি উপাধি পাওয়া সম্ভব হয়েছিল। সেই থিসিসের নাম 'চৈতন্যচরিতের উপাদান' —লেখক প্রয়াত বিধানবিহারী মজুমদার এবং অন্যতম পরীক্ষক রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। অথচ ৪৭ বছর পরে বাঙ্গালী দ্বারা প্রতিষ্ঠিত বিশ্ববিদ্যালয় বাংলার লেখা থিসিস কেবলমাত্র বাংলাতে লেখা হওয়ার দরুন প্রত্যাখ্যান করল। পশ্চিমবঙ্গ সরকার কি সামান্যতম এক অর্ডিন্যান্স দ্বারা আইনগত বাধাবিপত্তি থাকলে সংশোধন করতে পারেন না? কিন্তু করবার মন আছে কি?

পুঁজিতন্ত্রকে প্রবন্ধের মূল উপজীব্য ঘোষণা করে মাতৃভাষা সম্পর্কে মন্তব্য (ক্ষুদ্র হলেও) অনেকের কাছেই অপ্রাসঙ্গিক মনে হবে তা আমি জানি। কিন্তু মাতৃভাষা ব্যবহারের অধিকার হরণ কি চরম বঞ্চনা নয়? মাতৃভাষা বিসর্জন তো subsidy'র সর্বাপেক্ষা ভয়ানকরূপ। কিন্তু পুঁজিতন্ত্র সমাজতন্ত্র সাম্যবাদতন্ত্র—সবই তো মানুষকে নিয়ে—মাতৃভাষা ব্যবহার করবার মৌলিক অধিকার রহিতকারী কোন তন্ত্রই কি মানুষের কল্যাণ সাধন করতে পারে? সবচেয়ে দুঃখের কথা বাঙ্গালীর বাসভূমে বাংলার এই অবমাননার জন্য দায়ী বাঙ্গালী ছাড়া আর কেউ নন। এখানে কেন্দ্রীয় সরকারের বা মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের কোন ভূমিকা নেই। জ্যোতিবাবু এক লাইন আইন চালু করে দিয়ে বলতে পারেন যে কোনও ক্ষেত্রেই পশ্চিমবঙ্গে বাংলাভাষাকে অগ্রাহ্য করা যাবে না। জ্যোতিবাবুর নাম করছি এজন্য যে তিনি মুখ্যমন্ত্রী এবং স্বচ্ছন্দেই একাজটা করতে পারেন। তাছাড়া কিছুদিন আগে পশ্চিমবাংলাতেই কোন প্রকাশ্য সভায় তিনি দুঃখ প্রকাশ করেছিলেন যে বাংলাভাষাকে পূর্ণ স্বীকৃতি দেওয়া হয়নি।

মাতৃভাষা ব্যবহার করতে না দেওয়ার মধ্যে এক বিরাট বঞ্চনা (deprivation) রয়েছে যা কি না যার অন্যকে ভরতুকী দিতে। এ বঞ্চনাতে বাঙ্গালী ক্ষতিগ্রস্ত হয়; অন্যরা লাভবান হয় অর্থাৎ বাঙ্গালীর স্বার্থহানি ঘটিয়ে অন্যদের ভরতুকী (subsidy) দেওয়া হয়। সমাজে আমরা অনেকেই এই ভরতুকী উপভোগ করছি সচেতনভাবে বা অচেতনভাবে। "My whole life has been one long free lunch—and not just in the first year of my life. I have always been overpaid to do that which I would pay to do. বলেছেন নোবেল পুরস্কার বিজয়ী অর্থনীতিবিদ পল সামুয়েলসন ( Paul Samuelson : Economics from heart. A Samuelson Sampler-Edited by Maryann O Keating. Harcourt Braze Jovanovich, New york, 1983 P.8 সামুয়েলসন অন্যকে ঠকিয়ে বা জোর করে বেশি পয়সা আদায় করেন নি। "সারা জীবন বিনা পয়সায় খেয়ে আসছি এবং সব সময়ই আমি কাজের জন্য যা প্রাপ্য তার থেকে বেশিই পেয়েছি যদিও যে কাজের জন্য আমি টাকা পেয়েছি সে কাজ করার সুযোগের জন্য আমি নিজেই টাকা দিতে ইচ্ছুক ছিলাম" এই বক্তব্যের মধ্য দিয়ে সামুয়েলসন আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চেয়েছেন

এই সত্যের দিকে যে "There is only the most tenuous connection between rewards and deservingness" (ঐ পৃঃ ৪) অর্থাৎ যোগ্যতা এবং তজ্জন্য পুরস্কার এর মধ্যে যোগসূত্র খুবই ক্ষীণ বর্তমানে সমাজে—কী ধনতন্ত্র, কী সমাজতন্ত্র—কোন তন্ত্রেই যোগ্যতা অনুযায়ী পুরস্কার বন্টনের সাধারণ কোন নীতি নেই—অর্থাৎ কার্যতঃ। ভারত সংবিধানে সংবাদ প্রকাশ এবং মতব্য করার স্বাধীনতা স্বীকৃত তবুও পাকাপাকি কোন সংবাদপত্র জুন মাসের গোড়া থেকে আজ প্রবন্ধ লেখার দিন (২১ শে আগস্ট) পর্যন্ত আড়াই মাসেরও বেশী সময় যাবত সরকারী অনুমোদন ব্যতীত কোন সংবাদ বা মতব্য প্রকাশ করতে পারে না। আসামেও এ অবস্থা বেশ কিছুদিন বলবৎ ছিল। সুতরাং কোন রাষ্ট্রের সংবিধানে জনসাধারণের সুবিধার্থে কোন বিধান থাকলেও কার্যক্ষেত্রে তা নাও বলবৎ হতে পারে যেমন ভারত সংবিধানে কাজ করার মৌলিক অধিকার লিপিবদ্ধ থাকা সত্ত্বেও লক্ষ লক্ষ লোক বেকার দশায় জীবন যাপন করছে।

যোগ্যতা ও পুরস্কারের মধ্যে প্রচণ্ড ফাঁক পুঁজিবাদীদের ক্ষেত্রে। ভারতে পুঁজিপতিদের মতব্যগুলো এমন ভাবে দেওয়া হয় যেন দেশের সব সম্পদ তারাই তৈরি করেন, অন্যরা তাতে অনধিকার হাত লাগায়। এ প্রসঙ্গে বৃটিশ সমাজবিজ্ঞানী এল, টি, হবহাউসের (L. T Hobhouse) একটি মতব্য প্রণিধানযোগ্য। 'The organiser of industry who thinks he has 'made' himself and his business has found a whole social system ready to his hand in skilled workers, machinery, a market, peace and order —a vast apparatus and a pervasive atmosphere, the joint creation of millions of men and scores of generations. Take away the whole social factor and we have not Robinson Crusoe, with his salvage from the wreck and his acquired knowledge, but the native savage living on roots, berries and vermin'.

(Quoted in Samuelson)

অর্থাৎ শিল্পপতি মনে করে যে সে নিজে গড়া মানুষ; এবং সেই ব্যবসায়কে প্রতিষ্ঠিত করেছে। কিন্তু তার পিছনে রয়েছে একটি পুরোপুরি সমাজব্যবস্থা—যা শিল্পপতিকে সরবরাহ করছে দক্ষ শ্রমিক, যন্ত্রপাতি, বাজার, শান্তি এবং শৃঙ্খলা—যার পিছনে রয়েছে কোটি কোটি মানুষের পুরুষানুক্রমে অবদান। এই সামাজিক উপাদানটিকে (factor) সরিয়ে দিলে কি থাকবে? রবীনসন ক্রুসো (Robinson Crusoe)? না—কারণ রবীনসন ক্রুসোও সামাজিক জ্ঞান আহরণ করেছিলেন এবং নির্জন দ্বীপে একাকী বাস করতে হওয়া সত্ত্বেও তিনি ছিলেন সভ্য সমাজের প্রতিভূ এবং তার সঙ্গে ছিল সমাজে বিকশিত জিনিষের অবশিষ্টাংশ (salvage) যা তিনি জাহাজ ডুবির পর উদ্ধার করতে পেরেছিলেন। দীর্ঘকাল যাবত বিকশিত সমাজব্যবস্থা সরিয়ে নিলে থাকবে আদিম (savage) অধিবাসী, যে শিকড়, ফল এবং পোকামাকড় খেয়ে জীবনধারণ করে। কোন বাঙ্গালী লেখক হবহাউসের (Hobhouse) ন্যায় এরূপ প্রাঞ্জল ভাষায় পুঁজিবাদীদের ভূমিকার সীমাবদ্ধতাকে এভাবে তুলে ধরেছেন বলে আমার জানা নেই। অবশ্য হবহাউস নিতান্ত সাধারণ সত্যকে তুলে ধরেছেন। হবহাউসের পর অনেক বছর কেটে গিয়েছে। কিন্তু পুঁজিপতিদের আত্মম্ভরিতা একটুও কমে নি।

আজ পুঁজিপতিরা আত্মম্ভরিতার এমন পর্যায়ে পৌঁছেছে যেখান থেকে তাদের পক্ষে প্রকাশ্যে বলাই শুধু সম্ভব হয় না যে তারা জনতার সুবিধার জন্যই শিল্প বা ব্যবসায় প্রতিষ্ঠা করছে (যা তারা হবহাউসের সময়ও বলতো) তারা এও বলেছে যে এই "সামাজিক কল্যাণ বিধানের ভূমিকা গ্রহণের কৃতিত্বীকারের জন্য সমাজ এবং সরকারের উচিত তাদের—অর্থাৎ পুঁজিপতিদের—ভরতুকী দেওয়া—প্রয়োজন হলে সাধারণের মুখ থেকে অন্নের গ্রাস কেড়ে নিয়ে। পুঁজিবাদের এ এক বিশিষ্ট ভারতীয় রূপ—ভরতুকী-নির্ভর পুঁজিতন্ত্র (subsidised capitalism)। এই পুঁজিতন্ত্রের কর্মপ্রণালী বোঝা যাবে ভারতে কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারগুলি এই পুঁজিপতিদের সাহায্যার্থে কী করছেন তার উল্লেখ করলে। এ প্রবন্ধে সব কথা লেখা সম্ভব না, সুতরাং আমি শুধু কয়েকটি বিশেষ বিশেষ ভরতুকীর (subsidies) উল্লেখ করব।

পুঁজিপতিদের সরকারী তহবিল থেকে ভরতুকী দেওয়া বিশেষ যা ভারতে নতুন কোন ঘটনা নয় একথা

সত্য। তবে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পূর্বে এই ভরতুকী দেওয়া হোত প্রধানত বিদেশী বাণিজ্যের (রপ্তানী) ক্ষেত্রে। এদেশেও দেওয়া হোত নতুন রুটে ট্রেন বা বা ট্রাক চালু করার জন্য। কিন্তু সে ভরতুকীর পরিমাণ ছিল নগণ্য এবং যে কোন পরিকল্পনার সমগ্র ব্যয়ের তুলনায় সে ভারতুকীর অনুপাতও ছিল অতি সামান্য। গত ২০ বছর যাবত যে বহুলের ভরতুকী (subsidy) দেওয়া হচ্ছে ভারতীয় শিল্পপতিদের তা ছিল অকল্পনীয় —যেমন ছিল বর্তমান যুগের আকাশ-বিহারী যুনাকা (কোন কোন ক্ষেত্রেশুকরা ১০০ ভাগেরও বেশি ডিভিডেণ্ড দেওয়া হয়ে থাকে লগ্নীকারীদের)।

এই ভরতুকী প্রদান নীতির নাম "শিল্প উদ্যোক্তাদের প্রেরণাদান" incentive to enterpreneurs, যেহেতু ভারতের অধিকাংশে রাজ্যই শিল্পে অনুন্নত এই নীতির পিছনে জনসমর্থন সংগ্রহ করা খুবই সহজ। কলতঃ এই নীতিকে এতদূর জনপ্রিয় করে তোলা হয়েছে যে এই নীতিকে যথাসাধ্য কাযে পরিণত করার জন্য বিভিন্ন রাজ্যের সরকারগুলির মধ্যে খোলাখুলি এক তীব্র প্রতিযোগিতা দেখা দিয়েছে। এই প্রতিযোগিতার ফলে ১৯৬০ দশকে কলকাতার (পশ্চিমবঙ্গে) ফিলিপস্ কোম্পানীর প্রস্তাবিত বিস্তার সাধন না হয়ে ঐ কোম্পানীর আধুনিক ইলেকট্রনিক ইউনিট মহারাষ্ট্রে চলে যায়। দক্ষিণ বিহারের চিনি কলকে উঠিয়ে সুদূর কর্ণাটকে নিয়ে যাওয়া হয় এবং আরও বড় কথা বিহারে অবস্থিত টাটা ইঞ্জিনীয়ারিং ও লোকমোটিভ কোম্পানীর (টেলকো) সম্প্রসারণ ঘটে মহারাষ্ট্রে—বিহারে না হয়ে। এ বিষয়টির প্রতি বাঙ্গালীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করার প্রধান কৃতিত্ব আনন্দবাজার পত্রিকার শ্রীরণজিত রায়ের যাঁর মত সাহসী, পরিশ্রমী এবং সৎ সাংবাদিক আজকের ভারতে বিরল এবং যাঁর উপস্থিতি যে কোন পেশাকে গৌরবান্বিত করে। আমি বলি তাঁর লেখা The Agony of West Bengal-কে পশ্চিমবাংলার স্কুল, কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থশাস্ত্র, রাজনীতি এবং ইতিহাস বিভাগে অবশ্য-পাঠ্য করা উচিত যাতে বাঙ্গালীর আত্মপ্রবঞ্চনার সম্ভাবনা অন্ততপক্ষে আংশিক কম হয়। এবং এই বইটির বাংলা অনুবাদ (সংক্ষেপীকরণ নয়) হওয়া উচিত।

যাই হোক ১৯৭০ এর দশকে "শিল্প উদ্যোক্তাদের প্রেরণাদানের" (incentive to entrepreneurs) সরকারী নীতি এক গুণগত পরিবর্তন লাভ করে। "প্রেরণাদান" হয়ে ওঠে ভরতুকী দান, যেন তেন প্রকারেন। সরকারী তহবিল থেকে ক্রমাগতই বর্ধমান (increasing insentive) সাহায্য পুঁজিপতিদের দেওয়া হতে লাগল নিঃশর্তভাবে। সরকারী তহবিল থেকে এখনের নিঃশর্ত দান ক্ষুধাতুর দুর্ভিক্ষগ্রস্ত মানুষকেও দেওয়া হয় না; তাদেরও রাস্তা বানান বা অন্য কোন কাজ করতে হয় সরকারী ব্যবস্থায় দু মুঠো অন্ন অর্জনের জন্য। ভারতের বর্তমান "ভারতীয় সমাজতান্ত্রিক" (Indian brand of socialism) ব্যবস্থায় ধনীদের দেওয়া হয় (paid), দরিদ্রদের উপার্জন করে নিতে হয় (earn). Notice that I speak of what one gets 'paid' not what 'earns'. Economists, from Madame Pompadours (ফরাসী সম্রাট ১৫শ লুইএর রক্ষিতা যিনি শিল্পীদের উদারভাবে সাহায্য করতেন) medical councellor to last June's newly minted Ph. D. have always realized that there is only the most tenuous connection between rewards and deservingness—বলেছেন পল সামুয়েলসন (ঐ পৃঃ ৪)।

ভারতে বহুস্তরে শিল্পপতিদের সরকারী তহবিল থেকে 'প্রেরণা দান' করা হয়। ভারত সরকার, রাজ্য সরকার, সরকারী মালিকানায় পরিচালিত বিভিন্ন বিস্তীর্ণ প্রতিষ্ঠান (financial institution), ইলেকট্রিসিটি বোর্ড এবং অনেক প্রতিষ্ঠান সরকারী খরচে পুঁজিপতিদের "প্রেরণা দান" করার জন্য একের থেকে অপরে বেশি যায়। কী উপায়ে এ সকল প্রেরণা দেওয়া হয় তা এক বিরাট intellectual game. আগেকার দিনে কোন ব্যবসায় প্রতিষ্ঠা করার জন্য অর্থবিনিয়োগ করতে হোত লগ্নীকারীদের—অর্থাৎ ব্যবসায় মালিকদের। আজকাল তা আর দরকার হয় না। নতুন ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান বা শিল্পোদ্যোগ স্থাপনের জন্য শিল্পোদ্যোক্তাদের প্রজেক্টের আনুমানিক লগ্নীর এক চতুর্থাংশ অর্থ সংগ্রহ করলেই চলে আজকাল, অপর চতুর্থাংশ দেয় সরকারী মালিকানায় রাজ্য শিল্পবিকাশ নিগম (state industrial development Corpn.)। বাকী অর্ধেক মূলধন (equity capital) জনসাধারণের কাছে তোলা হয়।

কিন্তু কোম্পানী পরিচালনার নিয়ন্ত্রণ অধিকার থাকে শিল্প উদ্যোক্তাদের হাতে যারা প্রয়োজনীয় লগ্নীর এক চতুর্থাংশে বা তারও কম টাকা খাটায়। এটা মনে রাখা দরকার যে অনেক ক্ষেত্রেই এই শিল্প উদ্যোক্তারা শিল্প প্রতিষ্ঠান স্থাপনের প্রাথমিক কাজগুলোও (feasibility report) সরকারী প্রতিষ্ঠানদের দিয়ে করিয়ে নেয়। মূলধনের (equity capital) এক চতুর্থাংশে "শিল্প "উদ্যোক্তাদের জোগাড় করার সর্ত থাকলেও অনেক ক্ষেত্রেই এ টাকাটা পুরোপুরি নিজেরা না দিয়ে "শিল্প উদ্যোক্তারা" জনসাধারণের কাছ থেকে তুলে নেন বলাবাহুল্য শেয়ার বাজারের দালালদের মারফত। এ সম্পর্কে কলকাতার বিজনেস স্ট্যান্ডার্ড (Business Standard) পত্রিকার ১১শে আগস্ট ১৯৮৪ সংখ্যায় টাইকুন এক বিস্তৃত বিবরণী দিয়েছেন, আগ্রহী পাঠকরা তা পড়ে দেখতে পারেন। এটা বে-আইনী কাজ। কিন্তু আইন মেনে চলার বাধ্যতা একমাত্র নিঃস্ব অসহায় ছাড়া এদেশে আর কারই বা আছে।

আরও বলা দরকার যে যদি কোন নতুন শিল্প প্রজেক্টের আনুমানিক ব্যয় ২৫ কোটি টাকার বেশি হয় তবে "শিল্প উদ্যোক্তা" মূলধনের শতকরা দশ ভাগ জোগাড় করলেই যথেষ্ট। অর্থাৎ ঘোষিত সরকারী নীতি যদিও আয়ের এবং সম্পদের বৈষম্য কমান, সরকারী কার্যকরী ব্যবস্থা হচ্ছে ধনীদের ঋণ এবং ক্ষমতা বৃদ্ধি করার জন্য সর্বপ্রকার আর্থিক এবং প্রশাসনিক সাহায্য দান করা সরকারী তহবিল থেকে।

ভরতুকী (subsidy) দেওয়া হয় মূলধনের জন্য। ভরতুকী দেওয়া হয় টাকা ধার নেওয়ার জন্য। ভরতুকী দেওয়া হয় জমি কেনার জন্য। ভরতুকী দেওয়া হয় ইলেকট্রিক বিলের টাকা দেওয়ার জন্য। ভরতুকী দেওয়া হয় বিক্রয় কর দেবার জন্য। ভরতুকী দেওয়া হয় রেলে বা ট্রাকে কাঁচামাল আনার জন্য এবং উৎপাদিত শিল্প সামগ্রী বাজারে বিক্রয় করতে পাঠাবার জন্য। কেউ যেন মনে না করেন যে আমি বিন্দুমাত্রও অতিশয়োক্তি করছি। বস্তুত এ সম্পর্কে অতিশয়োক্তি করার মত ভাষা আমার অধিগত নয়।

ভরতুকী প্রদানের নানাবিধ কায়দা করা হয়েছে যাতে সমগ্র ভরতুকীর হিসাব সহজে কেউ জেনাতে না পারেন। যেমন ভারতের চারশতের মত জেলাগুলিকে ভরতুকী প্রদানের জন্য তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়েছে—'ক' 'খ' ও 'গ'। 'ক' শ্রেণীভুক্ত জেলাগুলি হল সেইসকল জেলা যেখানে কোন বৃহৎ বা মাঝারী শিল্প ইউনিট নেই (no unit of large and medium industry) ভারতে এ রকম জেলার সংখ্যা ১০১ টি। (তবে এ বিভাগ করার পর অনেক রাজ্যই তাদের অনেক জেলাকে বিভক্ত করে নতুন "শিল্পবিহীন জেলা" (no industry district) সৃষ্টি করেছে যাতে সেই সকল নবসৃষ্ট "শিল্পবিহীন" জেলার শিল্পোন্নয়নের জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের কাছ থেকে ঐ রাজ্যগুলি সাহায্য দাবী করতে পারে। তবে তা স্বতন্ত্র বিষয়)। 'খ' শ্রেণীভুক্ত জেলার সংখ্যা ৫৫, এগুলিকেও কেন্দ্রীয় সরকার "পশ্চাদ্‌পদ জেলা" (Backward district) বলে ঘোষণা করেছেন। এছাড়া "গ" শ্রেণীভুক্ত ২১৩টি জেলাও বিশেষ সুবিধাজনক সর্তে (concessional assistance) সরকারী সাহায্য পাবে।

'ক' শ্রেণীভুক্ত জেলাগুলিতে প্রোজেক্ট স্থাপনা করলে প্রয়োজনীয় লগ্নীর (investment needs) এক চতুর্থাংশ কেন্দ্রীয় সরকার ভরতুকী (subsidy) হিসাবে দেবেন অর্থাৎ একটাকা ফেরত দিতে হবেনা, এর ওপর সুদ দিতে হবে না এবং এ টাকার ওপর সম্পূর্ণ এবং একচ্ছত্র কর্তৃত্ব থাকবে যে শিল্পপতি প্রোজেক্টটি স্থাপন করছেন তাঁর হাতে। এই ভরতুকীর সর্বোচ্চ পরিমাণ বেঁধে দেওয়া হয়েছে প্রজেক্ট প্রতি ২৫ লক্ষ টাকা। "খ" জেলাতে এই ভরতুকী প্রয়োজনীয় লগ্নীর এক পঞ্চমাংশ দেওয়া হবে এবং প্রতি প্রজেক্টে ২০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত ভরতুকী দেওয়া হবে। কয়েকটি ক্ষেত্রে তা ১৫ লক্ষ টাকাও হতে পারে। "গ" জেলাতে প্রয়োজনীয় লগ্নীর শতকরা ১৫ ভাগ ভরতুকী দেওয়া হবে এবং এই ভরতুকীর পরিমাণ প্রজেক্ট প্রতি ১৫ লক্ষ টাকা হতে পারে। কোন কোন ক্ষেত্রে তা কিছু কম। অর্থাৎ ১০ লক্ষ টাকাও হতে পারে।

এতো গেল কেন্দ্রীয় সরকার প্রদত্ত ভরতুকী। এর ওপর আছে রাজ্য সরকার প্রদত্ত ভরতুকী। রাজ্য সরকারও প্রজেক্ট প্রতি ২৫ লক্ষ টাকা পর্যন্ত ভরতুকী দিতে পারেন লগ্নীর জন্য। কেন্দ্রীয় সরকার ভরতুকী না

দিলেও রাজ্য সরকার ভরতুকী দিতে পারেন এবং দুই সরকার মিলেও একই প্রজেকটের জন্য আলাদা আলাদা টাকা দিতে পারেন অর্থাৎ ৫০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত কেবল মাত্র লগ্নীর জন্যই ভরতুকী দিতে পারেন।

মনে রাখতে হবে যে এই ৫০ লক্ষ টাকা একেবারেই দিয়ে দেওয়া হল—নিঃশর্তভাবে শিল্পপতিকে। এই টাকার ওপর কী কেন্দ্রীয় সরকার কী রাজ্য সরকার কারুরই আর কোন কর্তৃত্ব রইলো না এবং এই টাকার লভ্যেরও কোন অংশ কেন্দ্রীয় সরকার বা রাজ্য সরকার পাবেন না—কোনদিনও।

এরপর আছে মূলধনে অংশ গ্রহণ (Capital participation)। যদি শিল্পপতি উপযুক্ত পরিমাণ মূলধন সংগ্রহ করতে না পারেন তখন সরকারী প্রতিষ্ঠান মূলধনের অংশীদার হতে পারে। যদি কোম্পানী লাভ করে তবে লগ্নীকৃত মূলধনের ওপর সরকারী প্রতিষ্ঠানও মুনাফা পাবে। তবে মনে রাখতে হবে যে সরকারী প্রতিষ্ঠান মূলধনে অংশগ্রহণ করলেও কোম্পানীর পরিচালনার ব্যাপারে সরকারী প্রতিষ্ঠান কোন কর্তৃত্ব খাটাবে না। বেসরকারী পুঁজিপতি সামান্য পুঁজি নিয়ে ব্যবসা করা সত্ত্বেও ব্যবসার পরিচালনার সর্বময় কর্তৃত্ব ঐ বেসরকারী পুঁজিপতির হাতেই থাকে।

একটি প্রজেকটকে কার্যকরী রূপ দিতে যত অর্থের প্রয়োজন হয় মূলধন দ্বারা এত বেশি অর্থ সংগ্রহ করা আজকাল সম্ভব হচ্ছে না। সুতরাং কেন্দ্রীয় সরকার ও রাজ্যসরকারগুলি ব্যবস্থা করেছেন যাতে নতুন শিল্প প্রজেকটগুলি প্রচুর অর্থ ঋণ রূপে নিতে পারে ব্যাঙ্ক অন্যান্য বিত্তীয় প্রতিষ্ঠানগুলি (financial institutions) থেকে। মূলধনের ব্যাপারেও ঐ একই নীতি—অর্থাৎ যে হারে সুদ সকলে দেয় তার থেকে অনেক কম হারে সুদ নিয়ে এই সকল প্রজেকটগুলিকে টাকা ধার দেওয়া। কিছুদিন আগে পর্যন্তও নিয়ম ছিল যে, যে শিল্প প্রজেকটের মোট ব্যয় তিন কোটি টাকার বেশি তাকে সুবিধাজনক হারে সুদের ভিত্তিতে ঋণ দেওয়া চলবে না। কিন্তু ভারতীয় সমাজতন্ত্রের ফলে মুদ্রাস্ফীতি বর্তমানে, তাই সুবিধাজনক হারে সুদে প্রদত্ত ঋণের উচ্চতম সীমা তিন কোটি টাকা থেকে বাড়িয়ে পাঁচ কোটি টাকা করা হয়েছে। এইভাবে কত শিল্পে "প্রোৎসাহ" দেওয়া হচ্ছে!!

শুধু তাই নয়। এইসব নতুন প্রজেকটের শিল্পপতিদের মূলধন বাজার (Capital market) থেকেও মূলধন অংশত তুলতে হয় কারণ সরকারী নীতি হচ্ছে যে সরকার প্রদত্ত অর্থসাহায্যে যেসব শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠছে তার লভ্যাংশের ভাগীদার অন্ততঃ অংশতভাবেও জনগণ কেন হয়। মূলধন বাজার থেকে টাকা তুলতে নানারকম খরচ লাগে, যেমন প্রথমত একটি পুস্তিকাতে প্রোজেকটের সংক্ষিপ্ত বিবরণী দিয়ে জানাতে হয় ঐ প্রজেকট কার্যকরী করতে কত টাকা লাগবে, টাকা কিভাবে তোলা হবে এবং প্রজেকট কতদিনে ফলপ্রসূ হবে ইত্যাদি ইত্যাদি। এই পুস্তিকাকে সাধারণ ভাবে বলা হয় প্রসপেকটাস। তাছাড়া মূলধন ও অংশগ্রহণের আবেদনপত্র ছাপতে হয় ও আবেদনপত্র যথাসম্ভব অধিক সংখ্যক ব্যক্তির মধ্যে বিতরণ করতে হয়। নতুন কোম্পানীর শেয়ার অনেকে আবার কিনতে চান না। সেজন্য এক রকমের লোক আছে যাদের বলা হয় under writer যারা গ্যারান্টি দেয় যে, নির্দিষ্ট সংখ্যক শেয়ার বিক্রয় করে দেবে। এই গ্যারান্টি দেবার জন্য 'আন্ডার রাইটার'গণ কমিশন দাবী করেন। সরকারী বিত্তসংস্থানগুলি এই আন্ডার রাইটিং কমিশনেরও অর্থসাহায্য ভরতুকী হিসাবে দেয়।

পশ্চাদপদ এবং অধিকাংশত অঞ্চলে শিল্প ইউনিট স্থাপনের সুবিধার জন্য আধারিক সংরচনা (infrastructure) স্থাপনের জন্যও সরকার বিনামূল্যে ঋণ দেন। এই ঋণের পরিমাণ লগ্নীর এক পঞ্চমাংশ পর্যন্ত হতে পারে। ঐ কোম্পানী যখন ব্যবসায়িকভাবে উৎপাদন আরম্ভ করে তখন ঐ ঋণের জন্য সাধারণভাবে যে হারে সকলে সুদ দেয় তার থেকে এরা অনেক কম হারে সুদ দেয়। ঋণ নেবার সময় যে Commitment charge সকলকে দিতে হয় এসকল ক্ষেত্রে তাও দিতে হয় না।

রাজ্য সরকার এই সকল নতুন শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলিকে বিক্রয় কর দেবার দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দেন। যে রাজ্যে বিক্রয় কর ছুট দেওয়া হয় না, সে রাজ্যে বিক্রয় কর বাবদে কোম্পানী দিতে পারে সে উদ্দেশ্যে কোম্পানীকে সরকারী তহবিল থেকে বিনাসুদে উপযুক্ত অর্থ ঋণ দেওয়া হয়, অক্ট্রয় (Octroi) কর কেরত দেওয়া

হয়। সরকার বেশি দাম দিয়ে ঐ সকল প্রতিষ্ঠানের উৎপাদিত দ্রব্য ক্রয় করেন, ইলেকট্রিসিটি কর থেকে রেহাই দেয়, সাতবছর পর্যন্ত করমুক্ত বিদ্যুৎ ব্যবহার চলতে পারে, আবার যে শিল্পে অত্যধিক বিজলীর ব্যবহার অপরিহার্য যেসকল শিল্পে বিদ্যুৎখাতে খরচের এক চতুর্থাংশ ভরতুকী হিসাবে দেওয়া হয়। জিনিসের জেনারেটিং সেট কেনার জন্য ভরতুকী এবং ঋণ, শিল্প ইউনিট স্থাপনের জন্য অধিকন্তুর টাকার ভরতুকী, বিত্ত প্রতিষ্ঠানগুলি প্রদত্ত ঋণ গ্রহণ সহজ করার জন্য প্রদত্ত ঋণের শতকরা ১০ ভাগ পর্যন্ত ব্যাঘাতমূলক ঋণ প্রদান ইত্যাদি, ইত্যাদি, ইত্যাদি।

আবার বলছি যে ওপরে যে তথ্য দেওয়া হয়েছে তার মধ্যে পুনরুক্তি অতিশয়োক্তি কিছু নেই। বস্তুত এই লিস্ট নিতান্তই অসম্পূর্ণ। শিল্পপতিদের যতরকম সুযোগসুবিধা দেওয়া হয় কেন্দ্রীয় সরকার ও রাজ্যসরকারের তরফ থেকে তার পুরো লিস্ট কেউ করতে পেরেছেন বলে আমার জানা নেই। দিল্লীতে অবস্থিত পাঞ্জাব হরিয়ানা দিল্লী চেম্বারস্ অব কমার্স আন্ড ইন্ডাস্ট্রী সম্প্রতি প্রকাশিত একটি পুস্তকাতে এই সকল সাহায্যের বিবরণী লোকসমক্ষে উপস্থিত করে এক মহান জনকার্য উপকারী কর্তব্য সম্পাদন করেছেন (Incentives to Entrepreneurs: An Inter-state Comparison, New Delhi, 1984, mimeographed pp 120. Rs. 25·00)।

ওপরে অসম্পূর্ণ বর্ণনাতে প্রতিভাত হল যে ভারতে পুঁজিবাদকে সরকার বিভিন্ন ভরতুকী দিয়ে গড়ে তুলছেন। এর বিরুদ্ধে বিশেষ কোন সমালোচনা হচ্ছে বলে কি মনে হয়? বস্তুত বিভিন্ন রাজ্য সরকারের মধ্যে এখন প্রতিযোগিতা লেগে গিয়েছে কে পুঁজিপতিদের বেশি সুবিধা দিয়ে নিজের দিকে টানতে পারেন। পশ্চিমবঙ্গ সরকারও এর ব্যতিক্রম নন। ২৮শে জুন ১৯৮৪ সালে কলকাতার দৈনিক "বিজনেস স্ট্যান্ডার্ড" পত্রিকায় এক প্রবন্ধে শ্রীসরোজকুমার পোদ্দার লিখছেন:

'The Government of West Bengal had earlier introduced an incentive scheme for industris in 1971 and 1978. The scheme had only a limited impact on industrial development ...the new incentive scheme introduced by the West Bengal Government in 1983, however, appear to be a substantial improvement upon the previous schemes containing as it does several attractive features such as provision of sales tax loans, development loans, subsidy on purchase of and installation of captive generating sets, special incentives for industrial investment in backward areas etc..." (Saroj kumar Poddar, Strategy needed to spur growth. Business Standard, 28 June 1984.)

পশ্চিমবঙ্গ সরকার প্রদত্ত সাহায্যের বিরুদ্ধে উল্লেখ করছি কেবল এ কথাটা বোঝাবার জন্য যে পুঁজিপতিদের ভরতুকি প্রদানে সকল রাজ্য সরকারই তৎপর। এই ভরতুকী দান ভাল বা খারাপ তার স্বতন্ত্র বিচার হওয়া প্রয়োজন। যদি সরকার নিজে থেকে শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতে না পারেন, যদি স্থানীয় অধিবাসীরা শিল্পোন্নতির জন্য অগ্রণী না হয় তখন হয় বাইরে থেকে পুঁজিপতিদের ডেকে আনতে হবে, নয়তো রাজ্যকে অনগ্রসর থাকতে হবে। এই দুইয়ের মধ্যে কোনটা শ্রেয়? আমরা যারা স্বাধীনতার সময় যৌবনে পা দিতে যাচ্ছিলাম, ভেবেছিলাম যে বিদেশী পুঁজিপতি এবং তাদের দেশী তাঁবেদারদের হটিয়ে আমরা নতুন অর্থব্যবস্থা, শিল্পব্যবস্থা, সমাজব্যবস্থা গড়ে তুলব যেখানে জনসাধারণের প্রয়োজনীয় সামগ্রীর অভাব ঘটবে না এবং কেউ বেকার থাকবে না। আমরা ভেবেছিলাম অর্থনৈতিক এবং সার্বজনিক ক্ষেত্রক (public sector)-এর মাধ্যমে এই নতুন সমাজ গড়ে তুলব। পরিকল্পনা দ্বারা দেশের মধ্যে আঞ্চলিক বিসমতা (regional imbalance) অসম্ভব বেড়েছে এবং সার্বজনিক ক্ষেত্রক জনসাধারণকে বঞ্চনা করার যন্ত্রে পরিণত হয়েছে (এমন কি টাটা বিড়লাও বোধহয় তথাকথিত সার্বজনিক ক্ষেত্রকগুলোর ন্যায় জনসাধারণকে এভাবে এতরকম শোষণ করেনি)।

এ কথাটা সুস্পষ্ট যে ভরতুকী দেওয়ার ফলে পুঁজিপতিদের হাতে অর্থনৈতিক ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত বা ঘনীভূত হচ্ছে। নিতান্ত সামান্য টাকা খাটিয়ে এই পুঁজিপতিরা হাজার হাজার গুণ বেশি অর্থ এবং সম্পদের ওপর কর্তৃত্ব করছে। নীচের সংক্ষিপ্ত তালিকা থেকে এই অস্বাভাবিক প্রভুত্বের আংশিক পরিচয় পাওয়া যাবে:

বৃহৎ ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানগুলির মালিকানা।

| শিল্প গ্রুপের নাম (Name of Industrial house) | গ্রুপের ইকুয়িটি (অর্থাৎ মালিকানা) যা সংবলে গ্রুপ পরিচালনকারীদের দখলী (লক্ষ টাকায়) | গ্রুপের সমগ্র পরিসম্পত্তি (asset) তে পরিচালকদের দখলীকৃত মূলধনের পরিমাণ (শতকরা ভাগ) |
|---|---|---|
| টাটা | ৩৬১.২৮ | ০.৫৬ |
| বিড়লা | ৩৩০.০০ | ০.১৮ |
| রুকতলাল | ৫২৯.১১ | ০.১১ |
| আপার | ৭০.১২ | ০.১৬ |
| শ্রীরাম | ১২.৪১ | ০.০৫ |
| কে পি. গোয়েঙ্কা | ২৪.৮১ | ০.২৫ |

(সূঃ Kumaran Pola: Family Feuds rock corporate sector, 'Commerce,' Bombay, 28 July, 1984 Page 125)

ব্যাপারটা একটু গভীরভাবে বিবেচনা করা দরকার। বস্তুত কোনও রকম আর্থিক ঝুঁকি না নিয়ে এইসব বৃহৎ শিল্প গোষ্ঠী দেশের প্রভূত অর্থনৈতিক সম্পদের ওপর একচ্ছত্র কর্তৃত্ব খাটাচ্ছে এবং এদের নিয়ন্ত্রিত করার কেউ নেই।

সরকারের অর্থাৎ জনসাধারণের কত টাকা এই সকল পুঁজিপতিদের হাতে দেওয়া হয়েছে আজ পর্যন্ত পুরো হিসাব পাওয়া অসম্ভব। একটি সরকারী হিসাব অনুযায়ী ১৯৮০ সালের মার্চ মাস পর্যন্ত সরকারী বিত্তপ্রতিষ্ঠানগুলি (financial institutions) ১২, ২০০'৪ কোটি টাকা দিয়েছে (যদি অনুমোদনের অঙ্ক ধরা হয় তবে ১৬,১৫১'০ কোটি টাকা অনুমোদন করা হয়েছে)। Industrial Development Bank of India (IDBI) দিয়েছে ৪১০৬'৪০ কোটি টাকা, Industrial Finance Corporation of India (IFCI) ১২০৪'৭৪ কোটি টাকা, Industrial Credit and Investment Corporation of India (ICICI) দিয়েছে ১৭০২'৮০ কোটি টাকা, Life Insurance Corpn. of India (LIC) দিয়েছে ৭১৬'০ কোটি টাকা, Unit Trust of India (UTI) দিয়েছে ৩৭০'০ কোটি টাকা; General Insurance Corpn. of India (GICI) দিয়েছে ২০৪'১ কোটি টাকা, Industrial Reonstruction Corpn. of India (IRCI)—যার নতুন নাম হয়েছে Industrial Reconstruction Bank of India (IRBI) দিয়েছে ১৪৬'৮ কোটি টাকা, State Financial Corpn. of different States (SFCS) দিয়েছে ২০৩৮'৫০ কোটি টাকা এবং বিভিন্ন রাজ্যের State Industrial Development Corpns. (SIDCS) দিয়েছে ৮৮৩'৫ কোটি টাকা। প্রায় ছয়টি প্রতিষ্ঠানের হেড অফিস বোম্বাই, সপ্তমটির হেড অফিস কলকাতা এবং অষ্টম ও নবম সিরিয়লের প্রতিষ্ঠানগুলির হেড অফিস ঘ ঘ রাজ্যে। (Report on Development Banking in India 1982-83, Industrial Development Bank of India, Bombay, 1984, Statistical Appendix, পৃঃ ১)

আগেই বলেছি যে, এই বিত্তপ্রতিষ্ঠানগুলি টাকা দেয় মূলধন হিসাবে এবং ঋণ হিসাবে। মূলধন হিসাবে টাকা দেওয়ার দরুণ এই সকল বিত্তপ্রতিষ্ঠান বিভিন্ন কোম্পানীতে মালিকানাসত্ত্বও লাভ করেছে অল্পবিস্তর। মূলধনে উপরিউক্ত সাতটি সর্বভারতীয় বিত্তপ্রতিষ্ঠান খাটিয়েছে ৩৪৫৭'০ কোটি টাকা ১৩০২টি কোম্পানীতে (ঐ গ্রন্থ, পৃঃ ১৩)।

যেহেতু ছয়টি বিত্তশালী সর্বভারতীয় বিত্তপ্রতিষ্ঠানের হেড অফিস ভারতের পশ্চিম প্রান্তস্থিত বোম্বাই নগরী (যার পর ভারতের আর স্থলসীমা নেই, আছে আরব সাগরের জলসীমা) স্বভাবতই ভারতের পশ্চিমাঞ্চলের রাজ্যগুলিই আর্থিক সাহায্য বেশি পেয়েছে। ভারতে ২২টি রাজ্য এবং নয়টি কেন্দ্র শাসিত অঞ্চল রয়েছে। কিন্তু মাত্র ৫টি রাজ্য মহারাষ্ট্র (শতকরা ১৬'৭ ভাগ) গুজরাত (শতকরা ১৪'১ ভাগ), কর্ণাটক (শতকরা ৭'১ ভাগ), তামিলনাড়ু (শতকরা ১'৬ ভাগ) এবং উত্তর প্রদেশ (শতকরা ৭'১ ভাগ) ১৯৮২।৮৩ সালে প্রদত্ত সমগ্র অর্থসাহায্যের অর্ধেকেরও বেশি পেয়েছে—অর্থাৎ এখানেও সেই ভরতুকী নীতি (subsidization) অন্য রাজ্য থেকে সম্পদ আহরণ করে এনে পশ্চিমাঞ্চলের রাজ্যগুলির

উল্লিখিত সাধন। কেউ যেন ভাববেন না যে এক বছরেই এ ধরণের অসম বণ্টন হয়েছে বিনিয়োগযোগ্য অর্থসম্পদের। সর্বভারতীয় বিত্তপ্রতিষ্ঠানগুলির কার্যারম্ভের শুরু থেকে ১৯৮০ সালের মার্চ পর্যন্ত প্রদত্ত অর্থসাহায্য বিচার করলে দেখা যাবে যে বিভিন্ন রাজ্যে মাথাপিছু অর্থসাহায্যের মধ্যে খুবই বিশেষ তারতম্য রয়েছে। মাথাপিছু অর্থসাহায্য গুজরাত (৪৫৬.৪৪ টাকা) মহারাষ্ট্র (৩৮৫'৬৫ টাকা), হরিয়ানা (২৫৩'৪৫ টাকা), কর্নাটক (২৫১'১৭ টাকা), পাঞ্জাব (২৪৭'৫৮ টাকা) তামিলনাড়ু (২৪০ টাকা), আসাম (৫১'১২ টাকা), বিহার (৫৪'০৭ টাকা), ওড়িশা (১১৫'৫৪ টাকা) ও পশ্চিমবঙ্গ (১৬৪'১২ টাকা)—অর্থাৎ এখানেও সেই ভরতুকীর খেলা।

সর্বভারতীয় বিত্তপ্রতিষ্ঠানগুলি তাদের কার্যকাল শুরু করা থেকে আরম্ভ করে ১৯৮৩ সালের মার্চ পর্যন্ত ১৬,৮৩৭'৫ কোটি টাকা সাহায্য দেয়—

| ক্ষেত্র | ১৯৮১-৮২ | ১৯৮২-৮৩ | ১৯৮৩ মার্চ পর্যন্ত |
|---|---|---|---|
| | কোটি টাকা | | সর্বমোট |
| পাবলিক (Public sector) | ৩৬৮'১ | ২৯৭'৩ | ১৮৭৪'৩ |
| যুগ্ম (অর্থাৎ সরকার ও পুঁজিপতি মিলিতভাবে) | ১৪৭'৪ | ১৫১'৩ | ১২৩০'৩ |
| সহকারী (Cooperative) | ১০৬'৬ | ২৩০'৪ | ৮০২'০ |
| ব্যক্তিগত পুঁজিপতি (Private) | ২১৭১'৭ | ২৫৫৩'২ | ১২৯৩০'৮ |
| | ২৭৯৩'৮ | ৩২৪০'৩ | ১৬৮৩৭'৫ |

অর্থাৎ শতকরা ৭৭ ভাগ অর্থসম্পদ ব্যক্তিগত মালিকানায় (দ্রঃ ঐ পুস্তক পৃঃ ১) পুঁজিপতিদের হাতে গিয়েছে। এ প্রসঙ্গে একটি প্রধান বিচার্য বিষয় এই যে সরকারী খাতে এত সহস্র কোটি টাকা ব্যয় করে পুঁজিপতিদের যে


মিলে সবে ভারত সন্তান
করি পূজা হয়ে এক প্রাণ

সকল ভারতবাসীর একাত্মবোধ
জেগে উঠুক মাতৃপূজার প্রাঙ্গণে

ইউনাইটেড ইন্ডাস্ট্রিয়াল ব্যাঙ্ক লিঃ

হেড অফিস : ১৭, আর এন মুখার্জী রোড ● কলিকাতা-৭০০ ০০১
রেজি। অফিস : ৭, রেড ক্রস প্লেস ● কলিকাতা-৭০০ ০০১

Progressive-UIB-13/84

সাহায্য দেওয়া হয়েছে বা হচ্ছে পুঁজিপতিরা তার কী উপযোগ করছেন? তাঁরা কি এ সম্পদ জনস্বার্থে খাটাচ্ছেন?

এ সম্পদ জনস্বার্থে ব্যবহৃত হলে উৎপাদন বৃদ্ধি হবে, নিয়োগ বাড়বে, জিনিষপত্রের সরবরাহ বাড়বে এবং জনসাধারণ অপেক্ষাকৃত সস্তা দরে তাঁদের প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি পাবেন। কিন্তু দেখা যাচ্ছে যে অসুস্থ (sick) শিল্পসংস্থার সংখ্যা ক্রমশই বাড়ছে। "The number of sick units taken up for nursing by All India Financial Institutions (AIFIS) as at December 1982 stood at 275 as against 230 a year ago. These also included units financed by banks, other financial institutions and later taken up for nursing and rehabilitation assistance by AIEIS. The total amount outstanding in respect of these units was Rs. 601 crores, of which an amount of Rs. 554 crores was in the form of loans and another sum of Rs. 47·3 crores was in the form of shares and debentures. As at end-December, 1982, a sum of Rs. 190 crores comprising principal Rs. 87 crores and interest Rs. 103 crores was in arrears from these units. The arrears contitututed 343% of the total loans outstanding (principal only) as at December end, 1982 as against 36·3% as at December-end, 1981. The lower percentage as at December-end 1982 was due to the fact that the total outstanding increased as a resuh of reschedulement/deferment or overdues and/or funding of interest." (Para 34. Report on Development Banking in India 1992-83. p17).

সোজা কথায় সরকারী টাকায় উৎপাদন না বেড়ে তা ক্রমে শিল্পে পরিণত হচ্ছে। এই হচ্ছে ভারতীয় গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্রের চরিত্র হল। গরীবের টাকা ধনীকে দেওয়া হবে যথেচ্ছাচার করার জন্য। এই যথেচ্ছাচারে Industial Development Bank of India অগ্রণী। একটা ব্যক্তিগত দৃষ্টান্ত দেওয়া বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হবে না। আমি যখন পাটনাতে ইংরাজী দৈনিক "সার্চলাইট"-এর সম্পাদক ছিলাম তখন আমি তথাকথিত অশোক পেপার মিল-এর জন্য সরকারী অর্থ অপচয়ের বিরোধিতা করি। সেজন্য আমাকে ভয় দেখান হয় এবং শাসান হয়। রাজনৈতিক প্রভাব খাটিয়ে বিহার বিধানসভার একটি কমিটিকে দিয়েও প্রস্তাব করান হয় যে সরকারের পক্ষে অশোক পেপার মিলকে আরও টাকা দেওয়া উচিত উত্তর বিহারের শিল্পোন্নয়নের স্বার্থে (মিলটি উত্তর বিহারের খাগড়াঘাটে অবস্থিত হবার কথা)। কিন্তু আমি এমন তথ্যাদি জনসমক্ষে উপস্থাপিত করলাম যে পাটনার অন্য দৈনিক পত্রিকা, বিশেষ ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান এবং শক্তিশালী চক্র সকলের মিলিত চেষ্টাতেও আমার বদলি বন্ধ করা সম্ভব হল না। অশোক পেপার মিলের কপালে যা লেখা ছিল—মিল liquidation-এ গেল। তারপর মিলের যন্ত্রপাতি নীলাম ঘোষণা করা হল। এই অবস্থায় IDBI উপযাচক হয়ে কোটি কোটি টাকা ঢেলে অশোক পেপার মিলকে পুনরুজ্জীবিত করার চেষ্টা করল। তারপর ১৪ বছর পার হয়ে গেছে—অশোক পেপার মিল এখনও বন্ধ—শুধু সরকারের কোটি কোটি টাকা IDBI এই মিলের পিছনে নষ্ট করেছে। কেন তা জানতে হলে ইন্দিরা গান্ধীর অনুরোধে অনুসন্ধানের জন্য নিয়োজিত শাহ কমিশনের ন্যায় উপযুক্ত ক্ষমতাসম্পন্ন কোন সর্বভারতীয় কমিশন নিযুক্ত করতে হবে। যে কোম্পানী liquidation-এ গিয়েছে তার পিছনে টাকা ঢালার অর্থ কি? মজা হচ্ছে যে যখনই নতুন করে টাকা নষ্ট করার প্রয়োজন দেখা দেয় তখনই কোন কোন মহল থেকে দাবি উঠবে যে মিল বন্ধ হলে লোক বেকার হবে। কার্যতঃ কিন্তু মিল কোনদিনই চলছে না। রাজনৈতিক ভেল্কীবাজীতে বিহারের অশোক পেপার মিলকে বাঁচাতে আসাম সরকারও টাকা ঢেলেছেন—ফল অবশ্য একই। মিল বন্ধ। সর্বভারতীয় বিত্তপ্রতিষ্ঠান-গুলি কীভাবে টাকা খরচ করছে সে সম্পর্কে একটি নিরপেক্ষ তদন্ত হওয়া প্রয়োজন—যাতে ভরতুকী-নির্ভর ভারতীয় পুঁজিতন্ত্রের চেহারাটা সুস্পষ্টভাবে ধরা যাবে। এই ভরতুকী-নির্ভর পুঁজিতন্ত্র দেশের সাধারণের পক্ষে ক্ষতিকারক এবং রাজনৈতিক গণতন্ত্রের শত্রু। এ বিষয়ে জনমত আকৃষ্ট হলে আমি এ প্রবন্ধ লেখার আমার শ্রম সার্থক মনে করব।

# হে আমার পৃথিবী আমার স্বদেশ

রণজিৎকুমার সেন

সকালে ঘুম থেকে উঠে আমি দৈনিক যে সংবাদপত্র হাতে পাই, তাতে নানা বিচিত্র সংবাদকে আবৃত ক'রে প্রধান যে সংবাদগুলি নানা শিরোনামে আমার চোখে স্পষ্ট হয়ে ওঠে তাতে আমি স্বভাবতই আঁৎকে উঠি। কোন্ জগতে আমি একজন সচেতন নাগরিক হিসেবে নানা কর্তব্যের দায়িত্ব নিয়ে বেঁচে আছি? পৃথিবী সম্পর্কে আমার মনের যে কল্পনা এবং স্বদেশ সম্পর্কে আমার চিত্তের যে অনুভূতি—সে তো সত্যের, সুন্দরের এবং মৈত্রীর। পৃথিবী ও আমার স্বদেশ সত্য হবে, এবং মৈত্রীময় হবে, তার সার্বভৌম চেহারাটির একটা সুন্দর চিত্রকল্প আমাকে প্রতিদিন বেঁচে থাকবার আনন্দ দেবে, আমার প্রাণকে অফুরাণ ঐশ্বর্যে ভরে তুলবে, এইটেই তো আমার স্বাভাবিক প্রত্যাশা ছিল। কিন্তু সূর্যের আলোয় যখন চোখ মেলে যেদিন এই পৃথিবীর একজন মানুষ বলে নিজেকে চিনলাম, দেখলাম এ পৃথিবী আমার জন্মসিদ্ধ ভাবনার পৃথিবী নয়, এ পৃথিবী তার সমস্ত রূপ ও রস নিয়েও যুদ্ধোন্মত্ত প্রলয়ঙ্করী। তার প্রলয়বিষাণে মৃত্যুর গর্জন, তার নিঃশ্বাসে প্রশ্বাসে তেজস্ক্রিয় বারুদের গন্ধ, তার ললাটলিপ্ত চন্দনের আড়ালে সারা বুকে বিষের ভাণ্ড। সেই বিষ পান ক'রে আমি যে নীলকণ্ঠ হবো, মাতৃগর্ভ থেকে এমন শক্তি নিয়ে আমি আসিনি। আমি এই বিংশ শতাব্দীর এক মানবসন্তান। আমাকে এই পৃথিবী এমন বাসনা দিতে পারেনা সেখানে মনে মনে সন্দেহ নেই, জনে-জনে অবিশ্বাস নেই, কূটনীতির পাশাকড়ি নেই, নেই রক্তচক্ষুর প্রদাহ আর সৃষ্টি বিনাশকারী যন্ত্রণা। সুরোদ্রের যুগ থেকে শুরু করে আধুনিককাল পর্যন্ত কেবলই একটানা যুদ্ধপর্ব চলেছে। কেবলই ক্ষুব্ধরাষ্ট্রের প্রতি বৃহৎ রাষ্ট্রের হুমকি, কেবলই সৈন্য মোতায়েন, কেবলই প্রতিরক্ষাখাতে অর্থভাণ্ডারের বণ্টন, কেবলই বন্টনকের আকাশ বিদারী শব্দ, মহাকাশ অভিযানেও চলেছে তারই পাল্টাপাল্টি। এই শতাব্দীর প্রথম ও দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে যত মানুষের প্রাণ সংহার করেছে, যত মানুষকে বিকলাঙ্গ করেছে, যত দেশ ধ্বংস করেছে—তার কলঙ্কিত ইতিহাস নিশ্চিহ্ন হবার আগেই শতাব্দী শেষের সর্বশেষ নিউট্রনবোমার যুদ্ধের হুঙ্কার উঠেছে পৃথিবীর ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্রের ভূমিপৃষ্ঠ থেকে। শান্তির ললিত বাণী এখানে ব্যঙ্গপরিহাসে পর্যবসিত। নানা ক্ষুদ্র রাষ্ট্রের ভূমিসীমার ঘাটি গেড়ে পৃথিবী গ্রাসের কী উন্মত্ত উল্লাসে মেতে উঠেছে বৃহত্তর শক্তিপুঞ্জ! প্রতিদিনের সংবাদপত্র তারই ধারাবিবরণী প্রকাশ করে আমার চেতনার সামনে উপস্থিত হচ্ছে, বেতার ও দূরদর্শনে তারই আঘাতপাত ঘটছে প্রতিদিন। আমার স্বাভাবিক সুন্দর ভাবনাগুলি টুকরো টুকরো হয়ে খ'সে পড়ছে। মনে হচ্ছে—লালকাটা ঘড়ি সময়ব্যবচ্ছেদের টেবলে আমি মৃত অবস্থায় শুয়ে আছি, অথবা মর্গে আমার মৃত পচা শরীর করোনারের বিচারশক্তিকে ধিক্কার দিয়ে এবং অসতর্ক ডোমের দৃষ্টি এড়িয়ে পড়ে আছে, কিম্বা ফাঁসিকাষ্ঠের সামনে আমি জল্লাদের হাতের ক্রীড়নক হয়ে গলায় দড়ি জড়াবার অপেক্ষায় আছি। —এই মনে হওয়াটা কি একটি সুস্থ মানুষের মনে হওয়া? তার পরিবর্তে তো আমি ভাবতে পারতাম এই পৃথিবীর নানা সমুদ্রের জল আমার কাছে কতো পবিত্র, এই পৃথিবীর নানা মনীষীর ভাবধারা আমার কাছে কত জ্ঞানপ্রদ! ভাবতে পারতাম সর্ব দেশের সকল মানুষ আমার আত্মীয়, পৃথিবীর প্রাণের স্পন্দনই আমার হৃৎপিণ্ডের স্পন্দন। কিন্তু এই স্বাভাবিক ভাবনার উপর কি করে একটা বিপরীতমুখি ভাবনা আমার মনের উপর চেপে বসলো? কেন নানা সমুদ্রের জলকে বিষাক্ত মনে হয়, কেন নানা মনীষীর ভাবধারা আমার কাছে কেবলই বিপরীতমুখি বিতর্কের অক্ষর হয়ে ওঠে, কেন সকল দেশের সকল মানুষকে আত্মীয় করে নেওয়া আমার বাধা, কেন পৃথিবীর প্রাণের স্পন্দন আমার হৃৎপিণ্ডের স্বাভাবিক স্পন্দনের সঙ্গে একই সুরে অনুরণিত হয়ে উঠছেনা? এতগুলো 'কেন' নিয়ে বৈদিক যুগে হলে বৃহৎ একখানি কেনোপনিষদ রচিত হতে পারতো, কিন্তু এ শতাব্দীর উপনিষদে আত্মতত্ত্ব উপলব্ধির কোন অবকাশ নেই; যা

আছে তা হচ্ছে নিজেকে বিশ্বঘটনা-ধারার সঙ্গে সামঞ্জস্য করে তোলা। এই সমন্বয়সাধনের ক্ষেত্রে আমার স্বকীয় চিন্তা বা আমার শুভাশুভ বোধ বলে কিছু থাকবার সুযোগ নেই। সেই যদি, তবে আমি কী, আমার অস্তিত্বের কি মূল্য? আমি কি যুদ্ধবাজদের সঙ্গে রণকৌশল শিক্ষা করবো, আমি কি বিমান ছিনতাইকারীদের সঙ্গে ছিনতাই বিদ্যায় পারদর্শী হয়ে উঠবো, অথবা যারা বলপূর্বক পরদেশে ঘাঁটি গেড়ে অপর দেশকে নিজেদের ক্রীতদাসে পরিণত করতে চায় আমি তাদের কারেন্সীর নোট নানা গলি-পথে নানা দেশে গোপন দিয়ে বেড়াবো? এই জিজ্ঞাসাই যখন এ যুগের নির্মম জিজ্ঞাসা, তখন প্রতিদিনের সংবাদপত্র সূর্যোদয়ের প্রথম প্রভাতে আমার কাছে কি এমন অমৃতবাণী নিয়ে আসবে যার দ্বারা আমি উপলব্ধি করতে পারবো অসত্য হতে আমি ক্রমেই সত্যতে গিয়ে পৌঁছাচ্ছি, অন্ধকার হতে আমি ক্রমেই আলোকে উত্তীর্ণ হচ্ছি, এবং মৃত্যুকে অতিক্রম করে আমি ক্রমেই অমৃতময় জীবনে প্রতিষ্ঠিত হচ্ছি! তার কোনো চিহ্ন আজ কোথাও স্পষ্ট নয়। সারা পৃথিবী আজ নাজিবাদে, সাম্রাজ্যবাদে, ধনবাদে আর জঙ্গীবাদে উন্মত্ত হয়ে উঠেছে, এখানে সমাজতন্ত্র ও সাম্যবাদের সঙ্গে তারা লড়াই ঘোষণা করে ধরাপৃষ্ঠকে একটা অতিকায় রোবটে পরিণত করতে উদ্যত। এখানে অহরহব্যাপী লড়াই কখনো থামছে না, এখানে বর্ণবিদ্বেষ থেকে যুদ্ধ করে যুদ্ধের আঘাতের ইতিহাস পর্যায়ক্রমে একই নিয়মে চলেছে। তারই ইতিহাস সমৃদ্ধ টেলিপ্রিন্টারের বুক থেকে উঠে এসে নানা 'ব্যানারে' নানা শিরোনামে নানা ভাষায় বর্ণিত হয়ে আসছে পাতে সংবাদপত্রে, আর সেই প্রতিদিনের ঘৃণ্যসহ সংবাদ আমার সূর্য-প্রভাতের পবিত্রতা ও প্রশান্তিকে একটা ভীতি-বিহ্বল ত্রাসে ও রুদ্ধশ্বাস-বেদনায় ভরে দিচ্ছে। আমার জন্মমুহূর্তের সুচারু অনুভূতির সুন্দর পৃথিবী রক্তকুলের কী দানবীয় রূপ নিয়েই না প্রতিদিন আমার চোখের সামনে প্রতিভাত হয়ে উঠছে! তাকে আমি ভালোবাসতে গিয়েও ঘৃণায় মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছি, আর সেই অপরাধে বার বার ধিক্কার দিচ্ছি নিজেকে।

সেই ধিক্কার ক্রমে ক্রমে শিলাস্তূপে পরিণত হচ্ছে যখন পৃথিবী থেকে চোখ ফিরিয়ে তাকাচ্ছি আমার স্বদেশের দিকে। উত্তরে যার হিমালয়, দক্ষিণে যার মহাসাগর, মহেঞ্জোদরো ও হরপ্পার সভ্যতা নিয়ে সিন্ধু নদের প্রাণের ধারায় যার বুকে নানা সংস্কৃতির চিহ্ন আঁকা, যার তপোবন একদা সামসঙ্গীতে ধ্বনিত হয়ে উঠতো, সেই বর্ণাঢ্যসম্ভব ভারতভূমি আমার স্বদেশ। তারই বন্দনায় উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছে কবির কণ্ঠ—

'যেদিন সুনীল জলধি হইতে
উঠিলে জননি ভারতবর্ষ!
উঠিল বিশ্বে সে কি কলরব,
সে কি মা ভক্তি, সে কি মা হর্ষ!
সেদিন তোমার প্রভাত বরায়
প্রভাত হইল গভীর রাত্রি,
বন্দিল সবে, 'জয় মা জননি!
জগদ্ধাত্রিনি! জগদ্ধাত্রি!

এই জগদ্ধাত্রী ভারতভূমি আমার স্বদেশ। এখানে বেদের কাল অতিক্রম করেও কপিল, বুদ্ধ, মহাবীর, চার্বাক, শঙ্কর, নানক, চৈতন্য, রামমোহন, রামকৃষ্ণ, পাশাপাশি সবাই আপন মর্যাদায় অধিষ্ঠিত। ক্রমে নানা ধর্মের সঙ্গে এসে মিলেছে গ্রীক, তুর্কি, পর্তুগীজ ফরাসী, মুসলমান ও ইংরেজ। বাহুবলে তারা আক্রমণকারী হলেও তারা নিজেদের নিজস্ব হারিয়েছে। ভারত ধর্মের সঙ্গে সকল ধর্ম মিলে গিয়ে ভারত আরও সমৃদ্ধ হয়েছে। ভারতবর্ষ মানুষকে শিখিয়েছে নিজেকে জানতে, বলেছে। 'আত্মানংবিদ্ধি', বলেছে: 'আত্মবৎ সর্বভূতেষু', বলেছে: 'মা হিংসী, মা গৃধঃ', মানুষকে সে দীক্ষা দিয়েছে ত্যাগে, বলেছে: 'তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথা,' শিক্ষা দিয়েছে সত্যভাষণের, সত্যনিষ্ঠার ও মনুষ্যত্বের। মানবীয় যতগুলি গুণ থাকলে একটি মানুষ মনুষ্যপদবাচ্য হয়, সেই গুণানুশীলনের যে মহৎ গ্রন্থাবলী তার প্রকাশ ঘটে এই ভারতবর্ষেই। এখানে ধর্মের পথ বিভিন্ন হলেও মনের পথ একই সরলরেখার অনুগামী। ভারতবর্ষ তাই চিরকাল নানা বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্যপ্রয়াসী, তাই বলেছে: 'সংগচ্ছধ্বং সংবদধ্বং সংবো মনাংসি জানতাম।' ভারতবর্ষ কোনোদিন কাউকে পরিহার না করে সকলকে হৃদয়ের সঙ্গে গ্রহণ করেছে। বাইরে থেকে যত শক্তি এসেছে, যত মতবাদ এসে দেশের চিত্তকে আবিষ্ট করতে চেয়েছে, তারা আপন ঔদ্ধত্যের কাছে পরাভূত হয়ে ভারতের ভাগীরথী স্রোতে মিলে গেছে। একদা চৌর্যবৃত্তির কোনো অবকাশ ছিলনা

এখানে। ফা-হিয়ান তাঁর ভারত-বৃত্তান্তে তাই বিস্ময়ের সঙ্গে উল্লেখ করেন। 'ভারতবর্ষে' আমি কখনো চুরির ইতিহাস পাইনি।' এই অপাপবিদ্ধ ভারতবর্ষ' একদিন লোক-শিক্ষায় সবার উপরে যে মানবতাকে তুলে ধরেছিল, সেই মানবতা ছিল সর্বশ্রেণীর মানুষকে নিয়ে। এমন মানবসত্যের জয়স্তম্ভ পৃথিবীর অন্য ভূখণ্ডে গগনস্পর্শী' রূপে দেখা যায়নি। এই ভারতবর্ষ' কার না জন্মভূমি' ? আমি এই ভারতবর্ষের সন্তান' এক ভূখণ্ডে জন্ম নিয়ে কবির কণ্ঠে সুর মিলিয়ে তাই বার বার উচ্চারণ করেছি—

'ভারত আমার, ভারত আমার,
যেখানে মানব মেলিল নেত্র,
মহিমায় তুমি জন্মভূমি মা,
গরিমায় তুমি তীর্থক্ষেত্র।'

জন্মকালকে অতিক্রম করে আমি যতই সর্বালোকে বেড়ে উঠেছি, ততই আমি এই তীর্থভূমির পায়ে মাথা নত করে নিজেকে এই বলে ধন্য মনে করেছি যে, এই পুণ্যতীর্থ ভারত যার স্বদেশ, সে তো হাজার হাজার বছরের বিপুল ঐতিহ্যের ঐশ্বর্যে সম্পদশালী, তার কাছে অবিরাম চলাটাই জীবন, থেমে পড়াটাই মৃত্যু ! আমি প্রতিদিন তাই মৃত্যুকে অতিক্রমকরে মহাজীবনে উত্তীর্ণ' হতেই চেয়েছি। বলেছি—মানব সত্য, মানুষের উপর আর কিছু নেই। মানুষকে তাই শ্রদ্ধা করেছি, ভালোবেসেছি, বিশ্বাস করেছি, নির্ভয়ে নির্ভর করেছি তার উপর, কারণ আমাদেরই কবিবাণী হচ্ছে—'যত জীব, তত শিব,' জীবকে শিব-জ্ঞান করতে হবে। মহাকালের শান্তিপরীক্ষায় শিবত্ব প্রাপ্তিই শ্রেষ্ঠ প্রাপ্তি। এই প্রাপ্তিকেই ভারতবর্ষ' চিরকাল প্রাধান্য দিয়েছে। সবার মিলনে পবিত্র করা এই তীর্থ' তাই একদিন মহাতীর্থে' পরিণত হয়েছিল। এখানে জৈন ও বৌদ্ধ মঠে, হিন্দুর মন্দিরে, খ্রিস্টানের গীর্জায়, মুসলমানের মস্‌জীদে যে বাণী উদ্গীত সে তো সাম্যের ও মৈত্রীর, সেখানে নেতিবাচক কিছু নেই, সবই ইতিবাচক। সমস্ত নদীর সলিলধারার এক মহাসমুদ্র। এই বিপুল ঐতিহ্যের উত্তরাধিকার আমি অর্জন করেছি বলেই সারা পৃথিবীর কাছে আমি একজন ভারতীয় ও বাঙালী নামে পরিচিত। এই বিরাট কালের ঐতিহ্যকে আমার রক্তের সঙ্গে মিশিয়ে আমি চিরকাল একজন খাঁটি আদেশিক হতে চেয়েছি। স্বদেশচিন্তাই আমার শ্রেষ্ঠ চিন্তা, স্বদেশের মর্যাদা রক্ষা করাই আমার ব্রত, স্বদেশবাসীর মুক্তির সঙ্গে আমার নিজের মুক্তিও একই সঙ্গে চিহ্নিত। তাই স্বদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে একদিন আমিও গ্রহণ করেছিলাম সৈনিকবৃত্তি, বলেছিলাম—

'বন্ধন ভয় তুচ্ছ করেছি,
উচ্চে তুলেছি মাথা
আর কেহ নয়,
জেনেছি মোরাই মোদের পরিত্রাতা' বলেছিলাম। জীবন মৃত্যু পায়ের ভৃত্যা, চিত্ত ভাবনাহীন।' মাতৃভূমির মুক্তিমোচনে এও ছিল এক মহাব্রত। সেদিন আমার চোখের সামনে যে মানুষগুলিকে দেখেছি কী তাদের দীপ্তি, কী তাদের ত্যাগ, কী তাদের মনুষ্যত্বের মহিমা। সবাই সেদিন একই মন্ত্রের মন্ত্রসাধী, সকলের অন্তরে বিবেকানন্দের সেই বাণী : 'হে ভারত ভুলিওনা—তুমি জন্ম হইতেই মায়ের জন্য বলিপ্রদত্ত, ভুলিওনা—তোমার সমাজ—সে বিরাট মহামায়ার ছায়া-মাত্র, ভুলিওনা—নীচ জাতি, মূর্খ, দরিদ্র, অজ্ঞ, মুচি, মেথর তোমার রক্ত, তোমার ভাই। হে বীর, সাহস অবলম্বন করো, সদর্পে বলো—আমি ভারতবাসী, ভারতবাসী আমার ভাই, ভারতের মৃত্তিকা আমার স্বর্গ, ভারতের কল্যাণ আমার কল্যাণ।'

সেই ভারত যেদিন খণ্ডিত হয়ে বিদেশী শৃঙ্খল-মুক্ত হলো, হলো স্বাধীন, সেদিন বেদনার সঙ্গে এই আশা যুক্ত ছিল—সোনার ভারত আবার স্বর্ণময়ী হয়ে উঠবে। আমার সারা দেহের রক্তকোষে সেদিন কী উল্লাস ! যে মাতৃভূমির আমি সন্তান, যার অন্ন-জলে আমার প্রাণবায়ু নিরন্তর প্রবাহিত, তার মহাজাগরণই তো আমার জাগরণ ! এ জাগরণ আমার একার নয়, সমগ্র মানুষের, সমগ্র ভারতবাসীর।

কিন্তু এ কি হলো ? কোথায় অকস্মাৎ থেমে গেল সেদিনের জন-তরঙ্গ ? কোথায় গেল সেই মানুষগুলি যাদের সন্তানদম' একদিন মাতৃঋণ পরি-শোধে সর্বস্ব পণ রেখেছিল। যে রাষ্ট্র শক্তি গড়ে উঠলো, সে রাষ্ট্রে অকস্মাৎ পারস্পরিক ক্ষমতার লড়াই দেখা দিয়ে একজন থেকে আর একজন কেন বিচ্ছিন্ন হয়ে যেতে লাগলো ? কেন শুধু ধনীর লক্ষ্মীর ভাণ্ডার উপচে পড়ে গরীবের ঘর শূন্য হয়ে যেতে লাগলো ? যে দেশের পঁচানব্বই ভাগ মানুষ খেতে-খামারে কলে-

কারখানার অফিসে আদালতে হৃদের বিনিময়ে গ্রাসাচ্ছাদন সংগ্রহ করতে হিমসিম খেয়ে ওঠে, তাদের সংসার নিরন্ন থেকে কেন মাত্র পাঁচভাগ মানুষ দিনে দিনে স্ফীত হয়ে উঠছে ? সমস্ত সাধু উচ্চারণের অন্তরালে তবে কি এই বৈষম্যই একদিন অন্তঃসলিলা প্রবাহের মতো জাতির চরিত্রে ক্লিন্ন শীল ছিল ? ভাবতে গিয়ে সারা মন আমার বিষাদে ভরে উঠলো। এই কি আমার সেই ধ্যানের ভারত এই কি আপামর জীবের মধ্যে শিবানুভূতি ? দিকে দিকে উদ্বাস্তুরা প্রাণ নিয়ে পালাচ্ছে, তার মধ্যেই সঞ্চারিত হচ্ছে সাম্প্রদায়িকতার বিষ, আঞ্চলিকতার দাহ আর কর্মগত স্বাতন্ত্র্য। অধিক মাত্রায় প্রগতিশীল হয়েও তাদের মধ্যে কোনো শীলচরণ লক্ষ্য করা যাচ্ছে না, একটা বিরাট মতলবের ভারখানা বুকের মধ্যে পোষণ করে এক একটি মানুষ চলেছে, আপন স্বার্থে সর্বত্র সিন্ধিলাভের প্রত্যাশায়। কিন্তু; দৃষ্টিসীমার মানুষকে চোখ পড়ে সমাজের একপাশে, তাদের মধ্যে আজও মনুষ্যত্বের মহিমা বিলুপ্ত হয়নি। কিন্তু নগণ্য সংখ্যার এই মানুষগুলি আজ বহুত্তর সমাজের পরিপ্রেক্ষিতে ঠাঁই পায় না। এর পরিণাম কি, এর শেষ কোথায় ?

সেই পরিণামের সংবাদ পরিবেশনের জন্যেই প্রতিদিন নানা রকম সেন্সার ও বাধা তুচ্ছ করে সংবাদপত্রগুলি নানা ব্যাপারে ভরে উঠছে। আমার চোখের সামনে তার এক একটি শব্দ কঠিন শিলাখণ্ডের মতো উৎক্ষিপ্ত। নারীর শ্লীলতাহানি, বহুহত্যা অনুন্নত সমাজের উপর নারকীয় অত্যাচার, নানাদিকে উগ্রপন্থীর তাণ্ডব গুণ্ডামী, মস্তানী, সমাজবিরোধী ও কালোবাজারীর আগ্রাসী অভিযান, ওয়াগন ব্রেকার, পকেটমার ও ছিনতাইকারীর দুরপনেয় তাণ্ডব, স্মাগলার ঘুষখোর ও দালালের ব্যাপক বিস্তৃতি, ডকে বন্দরে হেলাইয়ার্ডে গুণ্ডা, চোর ও মাস্তানের অভ্যুত্থান, খুনী ও ডাকাতের অতর্কিত আক্রমণ ; মজুতদারদের অসাধুতা আস্ফালন, ধর্মঘট ধর্মঘট, পীড়ন, অগ্নিসংযোগ ; দিনের পর দিন এক-একটি ঘটনা বুলেটের মতো এসে বিঁধছে আমার বুকে। সেই সঙ্গে আছে বেকার সমস্যা, নানা দল উপদল, ধর্মঘট, লক আউট, শ্রমিক মালিক বিরোধ, ছাত্রঅসন্তোষ, স্বাস্থ্যক্ষেত্রে ও শিক্ষাক্ষেত্রে অভূতপূর্ব বিপর্যয়, শিক্ষার নৈরাজ্য, কথায় ও আচরণে আপাতনীরতা, অফিসে আদালতে কর্মে ফাঁকি, কেন্দ্র-রাজ্য বিরোধ, কর্মবিমুখতা, অপসংস্কৃতি, অপরূপের উত্থান, সাম্প্রদায়িক ও আঞ্চলিক সঙ্কীর্ণতা, বর্ণভেদের বিস্তার। কুড়িটি উপসর্গের তৃতীয় শব্দটিই হচ্ছে 'অপ'। এই সীমিত ব্যবহৃত আভিধানিক শব্দটির এখন সামাজিক তাৎপর্য অধিকমাত্রায় বেড়ে যাবার ফলে আজ সারা ভারত জুড়ে প্রতিদিন যা ঘটছে সংবাদপত্রের পৃষ্ঠাগুলি প্রাত্যহিক নিয়মে তাতেই ভরে উঠছে। তার এক একটি শব্দের উপর চোখ বুলিয়ে নিতে গিয়ে আতঙ্কে শিউরে উঠছি। মনে হচ্ছে এই বুঝি অতর্কিতে কোনো আততায়ীর স্খলিত বুলেট আমাকে বিদ্ধ করে ! আমি প্রতিমুহূর্তে অসংখ্য ত্রাসের শিকার হয়ে আমার মানসিক সুকুমারবৃত্তিগুলিকে ফুলের মতো একত্রে গ্রথিত করে একটি সুন্দর মালার রূপ দিতে পারছিনা। সারা ভারত আজ উত্তাল। তারই প্রতিরূপ ভাসছে কাশ্মীরে, পাঞ্জাবে, মহারাষ্ট্রে, উত্তর প্রদেশে, আসামে, বিহারে, পশ্চিমবঙ্গে, ত্রিপুরার সর্বত্র ; আবারও খণ্ড ছিন্ন বিক্ষিপ্ত ভারতের নগ্ন বিকলাঙ্গ চিত্র উঁকি দিচ্ছে নানা দেশদ্রোহীর বিদ্রোহে। বিশ শতকের সমাপ্তিপর্বে ভারতের এই সামগ্রিক রূপ দেখে আজ বুঝি আর সেই সব বীর্যশুল্ক মৃত্যুঞ্জয় মানুষগুলিকে স্মরণে আনতে পারছিনা যারা একদিন ফাঁসির মঞ্চে জীবনের জয়গান গেয়ে গেছে, যারা যুগযুগ ধরে কারাগারে ও বীপান্তরে নির্বাসন ভোগ করে ভারতের মুক্তিকে ত্বরান্বিত করে গেছে। তুর্কি, পর্তুগীজ, ফরাসী, দিনেমার সুলতান, পাঠান, মোগল ও ইংরেজের নারকীয় অত্যাচার একদা শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে এদেশকে ক্ষত-বিক্ষত করেছে। এই বৈদেশিক অত্যাচারই ছিলে তিলে ভারতের চিত্তে জাগিয়েছিল জাতীয়তাবোধের মন্ত্র। আসমুদ্র হিমাচল সেদিন মন্ত্রিত হয়ে উঠেছিল 'বন্দেমাতরম' ধ্বনিতে, আমরা ভারতীয় সন্তানদল সেদিন বুঝতে শিখেছিলাম আমাদের এই জননী জন্মভূমি শুধুমাত্র দৃশ্যমান মৃত্তিকাগুলিনী নয়, সে চিন্ময়ীস্বরূপা-অনন্তরত্নপ্রসবিতা ধাত্রি ধরিত্রী ধনধান্যদায়িকা। তারই উদ্দেশ্যে কোটি কোটি হাত যুক্ত করে আমরা বলেছিলাম : 'এস মা, নবরাগরঞ্জিনী, নবকলধারিনী, নবদলে দীপ্তিনী, নবকমলবাসিনী, এস মা, গৃহে এস।'

আপন গৃহে স্বদেশজননীকে সেদিন আমরা মহিমান্বিত করতে চেয়েছিলাম। সে কি আজকের এই কলহ কুৎসিত প্রবঞ্চনায় অন্ধিত ভারতভূমিকে কল্পনা ক'রে? আজ কি একবারও হৃদয়কে আকাশে মেলে দিয়ে প্রশ্নায় ও নির্লোভে উচ্চারণ করতে পারি: 'বেনাহং নামৃতাস্যাং কিমহং তেন কুর্যাম?' সেই অমৃতের বাণী-কে শোনাবে? প্রভাতের নব সূর্যোদয়ে কোন্ সংবাদপত্র আমার জন্যে এমন অমৃত সংবাদ বহন ক'রে আনবে—যার দ্বারা আমি আনন্দের সঙ্গে বাঁচবার স্পৃহা বোধ করবো, যার দ্বারা আমি প্রতিদিনই নতুন হয়ে উঠবো, বলতে পারবো, 'ভারতের সমাজ আমার শিশুশয্যা, আমার যৌবনের উপবন, আমার বার্ধক্যের বারাণসী, ভারতের ভূমিকা আমার স্বর্গ, সমগ্র ভারতবাসী আমার ভাই, ভারতের কল্যাণ আমার কল্যাণ।'

কিন্তু এই শ্মশান বৈরাগ্যই শেষ কথা নয়, কোনো নেতিবাচক বিষয়কে সহজে মেনে নিতে মন প্রস্তুত নয়। জানি—শ্মশানের ধূম্রজালের বাইরে আছে প্রতীক্ষিত সূতিকাগৃহ—যেখানে নবজাতকের নব আবির্ভাবকে স্বাগত জানাতে তিমিরবিদারী অরুণাভ উষা এসে দাঁড়িয়েছে আশাদীপ্ত আলোর বরমাল্য নিয়ে। আমার সমস্ত প্রত্যাশাকে আমি সঞ্চারিত ক'রে যাবো তার চেতনার গভীরে। জানি: কংস কারাগৃহে যাঁর জন্ম, তিনিই হন একদিন কুরুক্ষেত্রের বিজয়ের সারথী। সমাজিমৃত্যু এই শতাব্দীর সম্ভাবিত কুরুক্ষেত্রে সদ্য আবির্ভূত সেই নবজাতকই মহাকালের রথের রশ্মি ধরে সারা ভারত ও সমগ্র পৃথিবীর মানুষকে পাঞ্চজন্যের নিনাদে সচকিত ক'রে শোনাবে: 'যেখানে পাপ, যেখানে অনাচার, রাষ্ট্রকলহে যে মাটি কলুষিত, যেখানে সাম্যের ঔদার্যের দুঃসাহসিক প্রতাপ, যেখানে ঘৃণ্য-দূষিত-কলুষিত-বন্যায়-বন্যায় মানুষ মরণোন্মুখ, সেখানে নতুন প্রাণের স্পন্দন নিয়ে শান্তি প্রতিষ্ঠায় আমি এই পৃথিবীর মাটিতে বারবার ফিরে আসি। আমার চক্ষের একটিমাত্র ঘূর্ণনে কোটি কোটি অমারাত্রি খণ্ড বিখণ্ডিত হয়ে যায়, দানব-দলনে ও মনুষ্যত্ব প্রতিষ্ঠায় আমি বার বার আবির্ভূত হই ধর্মসংস্থাপনে। আমি এক অনন্য জাগৃতপ্রাণ।'

অকস্মাৎ আমি যেন সেই প্রাণে প্রাণ পেয়ে আমার নিজের অলক্ষ্যেই কখন্ সেই নবজাতক হয়ে উঠি! এই শতাব্দী লাঞ্ছিত জাগতিক দৃশ্য তখন আর আমার কাছে মৃত্যুময় মনে হয় না, মাটির স্তরে স্তরে আমি নতুন জীবন খুঁজে পাই—যে জীবনে আছে গান, আছে আনন্দ, আছে সুন্দরের শিল্পচেতনা।

# জাতীয় সংহতির সমস্যা ও উত্তরণের পথ

বৈদ্যনাথ সাহা

সাম্প্রতিক কালে ভারতবর্ষে জাতি, ধর্ম, ভাষা, জনগোষ্ঠী, সংস্কৃতি, আঞ্চলিক স্বার্থ প্রভৃতি বিভিন্ন সমস্যাকে কেন্দ্র করে বিচ্ছিন্নতাবাদ মাথা চাড় দিয়ে উঠেছে। ফলে ভারতীয় জনগণের চিত্তে আবহমান কাল ধরে লালিত ঐক্য, সংহতি ও অখণ্ড জাতীয়তাবোধের ধ্যান ধারণা প্রচণ্ড কাকুনি খেয়েছে, একাত্মতাবোধ ও সংহত রাষ্ট্রীয় চেতনায় চিড় খেতে শুরু করেছে এবং সামগ্রিকভাবে আমরা এক গভীর সংকটের দিকে এগোচ্ছি। অনিবার্য কারণেই আজ এ প্রশ্ন উঠেছে। তাই জাতীয় সংহতির স্বপক্ষে দেশজুড়ে আওয়াজ উঠছে যে, সর্বপ্রকার সংকীর্ণতা বিভেদপন্থা ও প্রতিক্রিয়াশীলতাকে কঠোর হস্তে দমন করে জাতীয়তাবোধ ও ঐক্যবদ্ধ রাষ্ট্রীয় কাঠামোকে সুদৃঢ় করতে হবে। ভাষা, পোষাক পরিচ্ছদ ধর্ম, বর্ণ ও আচার সংস্কারে ভারতের অধিবাসীদের মধ্যে পার্থক্য এত বেশী যে জাতীয়তাবোধ বিনষ্ট হবার আশংকা ভিত্তিহীন নয়। তাছাড়া আসাম, ত্রিপুরা, পাঞ্জাব, মহারাষ্ট্র থেকে শুরু করে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ইদানীং যেসব ঘটনা ঘটে চলেছে তার পরিপ্রেক্ষিতে এই আশংকা আরও দৃঢ়মূল হচ্ছে।

ভারতের জাতীয় ঐক্য ও সংহতির সমস্যা ও সীমাবদ্ধতা প্রসঙ্গে আলোচনার আগে ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে জাতীয়তাবাদের স্বরূপ সম্পর্কে দু একটা কথা বলা দরকার।

সংক্ষেপে থেকে উনিশ শতকের মাঝামাঝি সময় পর্যন্ত গ্রেট বৃটেন ও পশ্চিম ইওরোপের বিভিন্ন দেশে সামন্ত তন্ত্র থেকে ধনতন্ত্রের ক্রমবিকাশ ঘটতে থাকে, সমাজ জীবনে অর্থনীতিতে ও রাষ্ট্রশাসন ব্যবস্থায় মৌলিক পরিবর্তন দেখা দেয় এবং মধ্যযুগের সামন্ততন্ত্র ও এতদ্ভিত্তিক রাজতন্ত্রের উচ্ছেদ ঘটিয়ে ধনিক শিল্পপতি ও বুর্জোয়া শ্রেণীর হাতে রাষ্ট্রক্ষমতা আসে। আধুনিক ধনতন্ত্র তার নিজস্ব গতিতে বিস্তার লাভ করে এবং বুর্জোয়া শ্রেণীর আধিপত্যে নতুন গণতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার পত্তন ঘটে। কিন্তু ধনতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থার ভেতরকার অনিবার্য দ্বন্দ্ব সংঘাতের ফলে ক্রমান্বয়ে আঠারো শতকের শুরু থেকে উনিশ শতকের মাঝামাঝি সময় পর্যন্ত সারা ইওরোপের দেশে দেশে জাতীয়তাবাদী চিন্তা ভাবনার উদ্ভব ঘটে এবং ধনবাদী ব্যবস্থার সামগ্রিক উন্নয়ন ও সম্প্রসারণের স্বার্থেই জাতীয়তাবাদকে মূলমন্ত্র হিসেবে গ্রহণ করে 'এক জাতি, এক রাষ্ট্র' গড়ে ওঠে। ফলতঃ জাতীয় ধনিক শিল্পপতি ও বুর্জোয়া শ্রেণীর আত্মপ্রসারের প্রয়োজনে এবং ধর্ম, ভাষা, সংস্কৃতি ও গোষ্ঠীগত চেতনাকে সমাজ জীবনে ও রাষ্ট্রব্যবস্থায় সুপ্রতিষ্ঠিত করার আন্তরিক বাসনায় ইওরোপে জাতীয়তাবাদের বিকাশ ঘটে। সুতরাং ইওরোপের জাতীয়তাবাদের ধারক বাহক হল নাগরিক চেতনায় সমৃদ্ধ সেখানকার জাতীয় ধনিক শ্রেণী।

উনিশ শতকে ভারতবর্ষে জাতীয়তাবাদের ভাবাদর্শ যারা ইওরোপ থেকে বহন করে এনেছিলেন তারা পাশ্চাত্য জ্ঞান বিজ্ঞানে ও উচ্চ শিক্ষায় সুশিক্ষিত এবং নাগরিক চেতনায় পুষ্ট মধ্যবিত্ত নব্য সম্প্রদায়। ইওরোপের বুর্জোয়া শ্রেণীর চিন্তা চেতনা ও মানসিকতা থেকে এঁদের জাতীয়তাবোধের ধ্যান ধারণা সম্পূর্ণ ভিন্ন জাতের। তাছাড়া ইওরোপে আধুনিক ধনতন্ত্রের অগ্রগতির পথে সমাজ মানসে, আর্থিক কাঠামোর ও রাষ্ট্রশাসন ব্যবস্থায় যে ধরনের আমূল রূপান্তর ঘটেছিল এবং সেই রূপান্তরের গতিধারায় যে নতুন বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক পরিবেশে ইওরোপে জাতীয়তাবাদের উদ্ভব ঘটেছিল, ভারতবর্ষে সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিস্থিতি সেই ভাবনায় ছিল একেবারে ভিন্ন আদলের। ভারতবর্ষে বিদেশী শাসন ও শোষণ ব্যবস্থা বিস্তারের ফলে এদেশে সামন্ততন্ত্রের গ্রামীণ কৃষি নির্ভর সমাজ জীবনে ও অর্থনীতিতে ভাঙন দেখা দেয়, স্বতন্ত্র গ্রামীণ অর্থনীতির

পরিবর্তে ঔপনিবেশিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থার সম্প্রসার ঘটে। এই বিবর্তনের গতিপথ ধরেই এদেশে জাতীয় ঐক্যচেতনা ও জাতীয়তাবোধের উন্মেষ শুরু হয় এবং সাম্রাজ্যবাদী শাসন ও শোষণের বিরুদ্ধে জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের ভেতর দিয়ে তার বিকাশ ও ব্যাপ্তিলাভ ঘটে। কিন্তু যে নবজাগ্রত বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায় মধ্যযুগীয় কুসংস্কার ও অন্ধকার থেকে আধুনিক শিক্ষাদীক্ষার আলোয় জাতীয় চেতনার মুক্তি আনতে চেয়েছিলেন তাঁরা প্রায় সকলেই ছিলেন নগর জীবনে অভ্যস্ত এবং তাঁদের যাবতীয় উদ্যোগ ও আন্দোলন উচ্চকোটি মহলে অল্প বিস্তর আলোড়ন সৃষ্টি করল বটে, কিন্তু সমাজের সর্বস্তরে, বিশেষতঃ নিচুতলার মানুষের জীবন যাত্রায় কোন পরিবর্তন আনতে পারলনা। একথা অনস্বীকার্য যে, উচ্চশিক্ষায় শিক্ষিত এই প্রাগ্রসর শ্রেণীই ভারতবর্ষে জাতীয়তাবাদের প্রবক্তা, কিন্তু তার এই সীমাবদ্ধতার দরুণ জাতীয়তাবাদ পরবর্তীকালে যে-সমস্যার সম্মুখীন হয়েছে জাতীয় সংহতির পথে আজকের দিনে সেটাই সবচেয়ে প্রধান অন্তরায়।

ভারতবর্ষে ব্রিটিশ শাসন বিস্তারের ফলে ইংরেজী শিক্ষার প্রচলন ঘটে, পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞান ও শিক্ষাদীক্ষার এদেশের অনগ্রসর সমাজ-ব্যবস্থায় আলোড়ন সৃষ্টি হয়। সাম্রাজ্যবাদী শাসন ও শোষণকে স্থায়ী করার জন্য স্বার্থপ্রণোদিত ভাবে ইংরেজ এ দেশে এক কেন্দ্রীয় শাসন ও শিক্ষাব্যবস্থা চালু করে। তারই ফলস্বরূপ ইংরেজী শিক্ষিত নাগরিক মধ্যবিত্ত শ্রেণীর আবির্ভাব ঘটে। এই নতুন সম্প্রদায় একদিকে যেমন বিদেশী শাসনের আধিপত্যে বিকাশমান আধুনিককালের শিল্প-বাণিজ্য, শিক্ষা ও প্রশাসন-ব্যবস্থা চালু রাখার কাজে সহায়ক শক্তি হিসেবে নিযুক্ত থাকেন, তারই পাশাপাশি প্রাগ্রসর মধ্যবিত্ত শ্রেণী এই আধুনিকীকরণের রীতি ও প্রকরণ মেনে নিয়ে দেশ বিদেশ থেকে জ্ঞান-বিজ্ঞানের সারবস্তু সংগ্রহ করে চিন্তায়, কর্মে, জীবনচর্যায় ও সমাজ-সংস্কারের ভেতর দিয়ে নতুন কালের ভাবনা এধরাকে রূপদানের চেষ্টা করেন। রাজা রামমোহন রায়, ডিরোজিও, বিদ্যাসাগর, মধুসূদন, বঙ্কিমচন্দ্র প্রমুখ বহুজনের কর্মপ্রচেষ্টায়, উদ্যোগ ও অধ্যবসায়ের ফলে এদেশে একের পর এক আন্দোলন দানা বেঁধে ওঠে। সতীদাহপ্রথার উচ্ছেদ, বিধবা বিবাহ প্রবর্তন, অস্পৃশ্যতা ও জাতিভেদ প্রথার বিরুদ্ধে আন্দোলন, মানবিকতাবোধ ও মানুষে মানুষে সমান অধিকার প্রতিষ্ঠার প্রয়াস প্রভৃতি বিভিন্ন আন্দোলনের ভিতর দিয়ে এদেশে যেমন একদিকে মধ্যযুগের ধর্ম ও কুসংস্কারের অন্ধকার থেকে নতুন যুগের শিক্ষা-সংস্কৃতি ও মুক্ত চৈতন্যের আলোয় সমাজ জীবনে নবজাগরণ আনার চেষ্টা হয়েছে, ঠিক তেমনি তার পাশাপাশি হিন্দুদর্শন ও বেদোপনিষদভিত্তিক ধর্মীয় আন্দোলন, খ্রীষ্টান মিশনারীদের ধর্মপ্রচার ও আন্দোলন, ইয়ংবেঙ্গল গোষ্ঠীর প্রতিক্রিয়াবাদ, শাক্ত ও বৈষ্ণব ভক্তিবাদ মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে। একদিকে যেমন দেশ-বিদেশের জ্ঞান-বিজ্ঞান ও সংস্কৃতি চর্চায়, শিক্ষা বিস্তারে, মুক্ত চৈতন্যের উন্মেষনে, নানাবিধ সংস্কারমূলক কর্মের ভেতর দিয়ে সমাজজীবনে নবজাগরণের সূত্রপাত ঘটেছে, দেশাত্মবোধ জাগ্রত হয়েছে। ঠিক তেমনি নানা ধর্মীয় গোষ্ঠীর আন্দোলন এবং পরবর্তীকালে হিন্দু ও মুসলিম উপজাতীয়তাবাদ এ দেশে জাতীয়তাবোধকে পদে পদে খণ্ডিত করেছে, প্রগতির তুলনায় প্রতিক্রিয়ার লম্ব হাত সর্বদানবিক ঐক্য ও সংহতিকে ব্যাহত করেছে। বিশেষতঃ নানা ধর্মীয় গোষ্ঠীর আন্দোলন এবং হিন্দুমেলা থেকে স্বদেশীযুগের রাজনৈতিক আন্দোলন এমনভাবে পাশাপাশি চলতে থাকে, যার ফলে জগৎ ও জীবন সম্পর্কে বিজ্ঞান-সম্মত নতুন কালের চিন্তা পথভ্রষ্ট হয়। উনিশ শতকের ভারতবর্ষে যে অখণ্ড জাতীয়তাবাদের সূত্রপাত ঘটেছিল, বিশ শতকের শুরু থেকেই তাতে ভাঙন ধরে এবং সম্প্রদায়গত বিভেদের সৃষ্টি হয়। ভারতীয় জাতীয়তাবাদের সবচেয়ে ক্ষতিকর ঘটনা হল এই হিন্দু-মুসলিম উপজাতীয়তাবাদকে কেন্দ্র করে দেশ বিভাগ।

ভারতবর্ষে জাতীয়তাবোধ সমস্ত ধর্ম গোষ্ঠী শ্রেণীকে কেন্দ্র করে ঐক্যের ভিত্তিতে গঠিত হয়নি বলেই সর্বভারতীয় একাত্মতাবোধ সৃষ্টি হয় নি। তাছাড়া উঁচু ও নীচু স্তরের

মানুষের মধ্যে সামাজিক ও অর্থনৈতিক ব্যবধান ভারতবর্ষের ইতিহাসে যুগে যুগে স্থষ্ট ও আবর্তিত হয়ে এসেছে। সামন্ততন্ত্রের অবক্ষয় ও ঔপনিবেশিক ধনতন্ত্র পত্তনের যুগে নাগরিক চেতনার উন্মেষ উচ্চশিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর আন্দোলন একেবারে নীচুতলার মানুষের অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনযাত্রাকে আমূল পরিবর্তন করতে পারেনি। ফলে উঁচুতলার শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর প্রাগ্রসর অংশের সংকীর্ণ গণ্ডীর মধ্যেই জাতীয়তাবাদের আদর্শ সীমাবদ্ধ থাকায় দরুণ অগণিত অশিক্ষিত, দরিদ্র, অবহেলিত ও গ্রামীণ কৃষিনির্ভর সমাজজীবনে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন ঘটেনি। তার ফলে উঁচু ও নীচু স্তরের মানুষের অর্থনৈতিক সম্পর্ককে কেন্দ্র করে জীবন ভাঙ্গ ও মানস প্রবণতার বিরোধ ও ব্যবধান ভারতীয় জনজীবনে অনৈক্য সৃষ্টি করেছে।

যুগে যুগে ভারতবর্ষে বহুজাতি, ধর্ম ও বিবিধ নৃগোষ্ঠীর সভ্যতা ও সংস্কৃতি এসে মিশেছে, কিন্তু একাত্মতাবোধ নিয়ে সম্পূর্ণভাবে মিলেমিশে এক জাতি হয়ে গড়ে ওঠেনি। বরং বিভিন্ন নৃগোষ্ঠী তাদের সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় পার্থক্য নিয়েই ভারতীয় ইতিহাসের কালচক্রে আবর্তিত হয়ে চলেছে। ভারতীয় ইতিহাসের পর পর কয়েকটি অধ্যায়ে শক্তিশালী শাসকের আবির্ভাব হয়ে ঘটেছে, বিশাল সাম্রাজ্য বিস্তার হয়েছে, সার্বভৌম শাসনব্যবস্থার মাধ্যমে রাজনৈতিক ঐক্যবন্ধনের চেষ্টা হয়েছে, বিভিন্ন ধর্ম ও সংস্কৃতির স্রোতধারা এসে মিশেছে, কিন্তু প্রকৃত ঐক্য ও সংহতি গড়ে ওঠেনি। বরং বিভিন্ন জাতি, গোষ্ঠী ও ধর্মের মধ্যে ভেদাভেদ প্রবণতা, ব্যবধান ও অনৈক্য বৃদ্ধি পেয়েছে।

বৈদিক যুগে আর্যসভ্যতার কাল থেকেই প্রাক আর্য, দ্রাবিড়, অনার্য ও আদিবাসী সম্প্রদায়কে অপাংক্তেয়,

আজ শরতের আকাশে-বাতাসে আগমনীর সুরের মূর্চ্ছনা...

মারুতি

আপনার
সারাজীবনের সাথী

দেবসন্স প্রাইভেট লিমিটেড কলিকাতা • পাটনা • দৌলহাটি • জামশেদপুর • কটক • আসানসোল

অবহেলিত অবস্থায় সামাজিক মর্যাদার আসন থেকে দূরে সরিয়ে রাখা হয়েছে, শূদ্রদাসে পরিণত করা হয়েছে। ষোল্শ যুগে এই নিম্নবর্ণের মানুষেরা কিছুটা সামাজিক মর্যাদার সুযোগ পেলেও পরবর্তীকালে সনাতন হিন্দু ধর্মের দাপটে এই শ্রেণী পুনরায় অস্পৃশ্য শূদ্র দাসে পরিণত হয়। উচ্চবর্ণের হিন্দুরা মুসলিম ও ইংরেজ রাজত্বকালেও প্রশাসন ব্যবস্থায়, সামাজিক ও আর্থিক সুযোগ সুবিধার ক্ষেত্রে বিশিষ্ট স্থান দখল করে থেকেছে। ফলে বহু যুগের লাঞ্ছিত বঞ্চিত উপেক্ষিত এইসব আদিবাসী হরিজন, নিম্নবর্ণের নানা জাতি উপজাতি ও সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মধ্যে স্বাতন্ত্র্যবোধ ও আত্মপ্রতিষ্ঠার চেতনা ইদানীং বৃদ্ধি পাচ্ছে। অন্যদিকে উচ্চবর্ণের হিন্দু সমাজেও রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষমতা নিয়ন্ত্রণের প্রয়াস বৃদ্ধি পাচ্ছে। জাতিভেদ, বর্ণপ্রথা, গোষ্ঠী বিরোধ জাতীয় জীবনে ঐক্য ও সংহতির ভাবাদর্শকে আরও দুরূহ করেছে।

ঔপনিবেশিক ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের যুগে ভারতবর্ষে এক কেন্দ্রীয় শাসনব্যবস্থার প্রবর্তন ঘটে। এককেন্দ্রিক রাষ্ট্রশাসন ব্যবস্থা গড়ে তোলার জন্য প্রয়োজনীয় সর্বপ্রকার বিধিব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। ফলে ভারতবর্ষে ভাবগত ঐক্যের একটা মোটামুটি কাঠামো তৈরী হয়ে যায়। এদেশে ব্রিটিশ পুঁজিবাদ লগ্নীপুঁজির সাহায্যে শুধুমাত্র প্রয়োজনভিত্তিক সীমিত শিল্পায়নের ভেতর দিয়ে পুরনো সমাজ কাঠামো ও ক্ষয়িষ্ণু সামন্ততন্ত্র আর্থিক বজায় রেখে এবং ঔপনিবেশিক স্বার্থে সামন্তভূস্বামী ও রাজন্যবর্গের সাহায্যে ও সমর্থনে শোষণ ও শাসনব্যবস্থা খাড়া রাখে। এদেশ থেকে কাঁচামাল সংগ্রহ করার জন্য এবং ব্রিটিশ শিল্পপণ্যের বাজার হিসেবে এদেশের মানুষকে শোষণ করার জন্য যে পরিমাণ বাণিজ্যিক ও আর্থিক সম্প্রসারণ ও নিয়ন্ত্রণ দরকার এবং সেই হেতু এককেন্দ্রিক রাষ্ট্র শাসন ব্যবস্থা গড়ে তোলার জন্য যে ধরণের প্রশাসন, আইন, শিক্ষাব্যবস্থা, যাতায়াত ব্যবস্থা, ডাকব্যবস্থা, রেলপথ প্রভৃতি বাস্তবায়ন সামাজিক, রাজনৈতিক ও প্রগতিমূলক উন্নয়ন প্রয়োজন, ব্রিটিশ শাসকেরা ভারতবর্ষে তার বেশী আধুনিক কর্মপ্রচেষ্টার বিন্দুমাত্র বিস্তার ঘটতে দেয়নি। ফলে ঔপনিবেশিক পুঁজিবাদ, ক্ষয়িষ্ণু সামন্ততন্ত্র এবং এদেশে দুর্বল ধনিক বণিক বুর্জোয়া শ্রেণীর আধিপত্যে গড়ে ওঠা ভারতের আর্থিক বনিয়াদ পঙ্গু হয়ে পড়ল। গ্রামীণ অর্থনীতি ভেঙ্গে যাবার দরুণ জমির ওপর একদিকে যেমন জনসংখ্যার চাপ বাড়তে লাগল, অপরদিকে অনুন্নত ধনতান্ত্রিক অর্থনীতির পরিবেশে এ দেশে পুঁজিবাদী শিল্পবাণিজ্যের পরিপূর্ণ বিকাশ না হওয়ার ফলে শহরের কল-কারখানা ও বাণিজ্য সংস্থায় কর্মসংস্থানের সুযোগ ঘটল না। ইংরেজ আমলে শিক্ষা প্রগতি ও আধুনিকতার 'পরশ' নাগরিক মানুষজন অল্পবিস্তর অনুভব করলেও কৃষিনির্ভর গ্রামীণ জীবনে তার কোন প্রভাব পড়লনা। ফলে গ্রাম ও শহরের মধ্যে সামাজিক, অর্থনৈতিক জীবনপ্রবাহ ও মনোভঙ্গির দূরত্ব সৃষ্টি হয়ে গেল। এই দূরত্বের ফলে একদিকে যেমন প্রগতি ও আধুনিকতার বিস্তার ঘটলনা, অন্যদিকে তেমনি জাতীয়তাবোধও খণ্ডিত হল।

তথাপি উনিশ শতকের ভারতবর্ষে ভাবগত ঐক্যের পটভূমিতে যে জাতীয়তাবাদের উন্মেষ হয় এবং ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে জাতীয় মুক্তি সংগ্রামের ভেতর দিয়ে যার পরিপূর্ণ বিকাশ ঘটে, তা শুধুমাত্র শিক্ষিত সমাজের সংস্কারমূলক আন্দোলন, সন্ত্রাসবাদ বা অহিংস আন্দোলনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিলনা, অনুন্নত অবহেলিত অশিক্ষিত বহুতর জনগণের মধ্যেও সশস্ত্র বিদ্রোহের রূপ নিয়ে আত্মপ্রকাশ করেছিল। কোল উপজাতি বিদ্রোহ, সিধু কানুর নেতৃত্বে সাঁওতাল বিদ্রোহ, চুয়াড় বিদ্রোহ, কৃষক বিদ্রোহ, সন্ন্যাসী বিদ্রোহ, নীল বিদ্রোহ, বিরসা মুন্ডার নেতৃত্বে মুন্ডা উপজাতি বিদ্রোহ—এমন অসংখ্য সশস্ত্র বিদ্রোহ ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসের এক একটি অধ্যায়কে গৌরবোজ্জ্বল করে তুলেছে। দেশের অগণিত কৃষক শ্রমিক মেহনতী মানুষ বিশ্বাস করেছিল যে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ উচ্ছেদ হলে এদেশে শোষণের অবসান ঘটবে, সমস্ত শ্রেণীর মানুষের সঙ্গে নীচুতলার সমাজ জীবনেও মুক্তি আসবে। কিন্তু দুঃখের বিষয় জাতীয় নেতৃত্ব এইসব বিদ্রোহের সুযোগ নিয়ে আপামর জনগণের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করে তাকে সশস্ত্র গণবিপ্লবের পথে নিয়ে যেতে পারেনি ; বরং তার পরিবর্তে আপোষ রফার ভেতর দিয়ে এদেশে সার্বভৌম রাষ্ট্রশাসন ক্ষমতা বিদেশী

সাম্রাজ্যবাদী-ধনবাদী শাসকশ্রেণীর হাত থেকে জাতীয় ধনিক শ্রেণীর হাতে নিয়ে এসেছে। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ-ধনবাদের আওতায় গড়ে ওঠা এদেশের অনগ্রসর ধনতন্ত্র এবং তার ওপরে নিভর্রশীল জাতীয় নেতৃত্ব সহজাত দুর্বলতার দরুণ রাজনৈতিক আন্দোলনের পথেই এগিয়েছে, গণ-বিপ্লবের পথ সভয়ে পরিহার করেছে।

স্বাধীনতার পর শাসক ধনিক শ্রেণী ও জাতীয় নেতৃত্ব অনুন্নত ও সংখ্যালঘু শ্রেণী সহ সমস্ত মানুষকে শোষণ, অন্যায় ও অবিচারের হাতথেকে রক্ষাকরার জন্য এবং সেই সংগে প্রত্যেকটি আঞ্চলিক ভাষার স্বীকৃতি, সংস্কৃতি রক্ষা, শিক্ষা ও কর্ম-সংস্থানের দ্রুতপ্রসার ও সামগ্রিক উন্নয়নের জন্য ভারতীয় সংবিধানে মৌলিক অধিকারের যেসব প্রতিশ্রুতি দিয়েছে, তাও কার্যত বাস্তবে রূপায়িত করেনি। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী শাসকেরা ক্ষয়িষ্ণু সামন্ততন্ত্র এবং বর্ণ জাতি ও বর্ণ ভিত্তিক পুরনো সমাজ কাঠামোকে আংশিক জীইয়ে রেখে ভেদনীতির সাহায্যে বুর্জোয়া শোষণ ও শাসন ব্যবস্থা চালিয়ে এসেছে। তার ফলে জাতি, ধর্ম, বর্ণ, গোষ্ঠী ও বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে অসন্তোষ বৃদ্ধি পেয়েছে, দ্বন্দ্ব ঘটেছে এবং ইংরেজ শাসকেরা সুকৌশলে পেছন থেকে তাকে মদৎ জুগিয়েছে। স্বাধীনতার পর শাসক ধনিক শ্রেণী অনগ্রসর ধনতন্ত্রের দায় জনগণের ওপরে চাপিয়ে আত্মরক্ষার পথ খুঁজেছে। ব্রিটিশ ধনতন্ত্রের আওতায় গড়ে ওঠা ভারতীয় ধনতন্ত্রের স্বাভাবিক বিকাশ হয়নি। তার ওপরে সামন্ততান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থার সম্পূর্ণ উচ্ছেদ না ঘটিয়ে, বরং তাকে আংশিক জীইয়ে রেখে গড়ে ওঠার দরুণ আধুনিক শিল্প বিকাশের পথে তার অগ্রগতি ব্যাহত হয়েছে। পরবর্তীকালেও নানা কারণে তার সুষম বিকাশ ঘটে নি। তাই ধনতন্ত্র আজ সংকটের আবর্তে পড়ে নিজের সর্বপ্রকার দুর্বলতার দায় শোষিত জনগণের ঘাড়েই চাপাতে চায়। শাসক ধনিক শ্রেণী ও জাতীয় নেতৃত্ব ইংরেজ শাসকদের অনুসৃত ভেদনীতিকে অবলম্বন করে, ঐক্য, সংহতি ও জাতীয়তাবাদের আপ্তবাক্য আওড়ে, সংবিধান


*সংবাদ রচনায়, মতামত প্রকাশে এবং*
*রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গীতে অনন্য*

# সত্যযুগ

*জনসাধারণের একমাত্র মুখপত্র*

নির্দিষ্ট অধিকারের বাইরে প্রতিযোগিতা দিয়ে এবং প্রয়োজন ক্ষেত্রে (জনসংখ্যার অনুপাতে, বৈদেশিক আক্রমণের আশংকায়—এই ধরণের নানা কারণ দেখিয়ে) তা খর্ব করে সুকৌশলে রাষ্ট্র শাসন ব্যবস্থায় টিকে থাকতে চাইছে। এতকাল ভারতে জাতীয়তাবাদী স্বাধীনতা আন্দোলনের স্বার্থবশতে অবহেলিত শোষিত শ্রেণী বাধ্য হয়ে সব অত্যাচার সহ্য করে মুক্তির আকাঙ্ক্ষায় দিন গুনেছে। কিন্তু স্বাধীনতার পর থেকে নিম্নবর্ণের মানুষ, শোষিত অবহেলিত মানুষ আত্মপ্রতিষ্ঠার সংগ্রাম শুরু করেছে। কারণ নিপীড়িত মানুষ উপলব্ধি করেছে যে সমস্যা সমাধানের নামে যত কর্মসূচী গৃহীত হোক-না-কেন সাংবিধানিক পথে বৃহত্তর জনজীবনে প্রকৃতপক্ষে কোন মৌলিক পরিবর্তন আসবে না। তাই আদিবাসী, হরিজন, পার্বত্য উপজাতি, ওপরতলী ও সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মধ্যে ভাষা, ধর্ম বর্ণ ও সংস্কৃতিকে কেন্দ্র করে স্বাতন্ত্র্যবোধের চেতনা বৃদ্ধি পাচ্ছে। তাছাড়া শিক্ষাব্যবস্থার ত্রুটি, কর্মসংস্থানের অভাব, রাজ্যে রাজ্যে কেন্দ্রের অসম নীতি প্রভৃতি বহুবিধ কারণে আঞ্চলিকতার রোক ও বিচ্ছিন্নতাবাদ মাথাচাড়া দিয়ে উঠছে।

ভারতীয় প্রাচীন সমাজ কাঠামোর জাতিভেদ ও বর্ণপ্রথার যে বীজ নিহিত ছিল, বহু শতাব্দী ধরে যা অনৈক্যের সৃষ্টি করেছে, তাই আজ জাতিগত বিদ্বেষ, বৈষম্য ও বিরোধের আকারে আত্মপ্রকাশ করছে। বিহার উত্তরপ্রদেশ, অন্ধ্র, মধ্যপ্রদেশ প্রভৃতি বিভিন্ন জায়গা থেকে দাঙ্গা-হাঙ্গামা, হরিজন ও নিম্নবর্ণের মানুষের ওপর অত্যাচারের ঘটনা জাতীয় সংহতিকে নষ্ট করছে এবং অসংগঠিত হরিজনদের মধ্যে বিচ্ছিন্নতার রোক বাড়ছে। ইতিপূর্বে বাংলা ভাষাভাষী শ্রীহট্ট জেলার হরিজনদের গণভোটের মাধ্যমে পাকিস্থানে ঠেলে দেওয়া হয়েছে। সঠিক দৃষ্টিভঙ্গি ও নেতৃত্বের অভাবের দরুণ হরিজনদের আন্দোলন বিপথগামী হলে তা জাতীয় সংহতির পথেই অন্তরায় সৃষ্টি করবে।

আদিবাসী ও উপজাতি সমাজের সমস্যাও ভয়াবহ। তাদের ভাষা ও সংস্কৃতি উপেক্ষিত, অর্থনৈতিক শোষণে ও সামাজিক নিপীড়নে তাদের অস্তিত্ব সঙ্কটময়। ত্রিপুরা বিহার পশ্চিমবাংলা মধ্যপ্রদেশ ও ওড়িশার বিভিন্ন অঞ্চলে তাদের আত্মপ্রতিষ্ঠার সংগ্রাম যেভাবে উগ্ররূপ ধারণ করছে, তাদের সমস্যার সমাধান না হলে এবং তাদের আন্দোলনকে শোষিত শ্রমিকশ্রেণীর ধনবাদী রাষ্ট্রশাসনব্যবস্থা উচ্ছেদের আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত করে দিতে না পারলে, বৃহত্তর সমাজ জীবন থেকে উপজাতি সমাজের বিচ্ছিন্নতার রোক জাতীয় সংহতির পক্ষে বিপজ্জনক হয়ে উঠবে।

ভারতবর্ষের বিভিন্ন রাজ্যে বিচ্ছিন্নতাবাদ ও আঞ্চলিকতাবাদ দিন দিন ভয়াবহ আকার ধারণ করছে। আসামে বিদেশী বিতাড়নের আন্দোলন, পাঞ্জাবে খালিস্তানের দাবি, বিহারে ঝাড়খণ্ডের দাবি, নেপালী ভাষার স্বীকৃতিকে কেন্দ্র করে গুর্খাল্যানের দাবি, পৃথক উত্তরখণ্ডের দাবি মহারাষ্ট্রে বিদর্ভ রাজ্যের দাবি —এসবই হচ্ছে বিচ্ছিন্নতাবাদের উগ্র প্রকাশ। এ ছাড়া আসাম, বিহার, ওড়িশা, কর্ণাটক, মহারাষ্ট্র, অন্ধ্র, গুজরাট, তামিলনাড় প্রভৃতি বিভিন্ন অঞ্চলে আঞ্চলিকতাবাদ মাথাচাড়া দিয়ে উঠছে। এইসব রাজ্যে চাকরি ও অর্থনৈতিক সুযোগ-সুবিধা এমন কি বসবাসের অধিকারও সেইসব রাজ্যের স্থানীয় ব্যক্তিদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখতে হবে। আঞ্চলিকতাবাদ শুধুমাত্র আসামেই বিরাট আকার ধারণ করেনি, বিভিন্ন রাজ্যেই নিত্যনৈমিত্তিক ঘটে চলেছে। অন্ধ্র তেলেঙ্গানা ও তেলেঙ্গানার বাইরের অঞ্চলের লোকজনদের মধ্যে সংঘর্ষ তার আর একটি উদাহরণ।

আসামে, ত্রিপুরা ও সমগ্র উত্তর-পূর্বাঞ্চলের পরিস্থিতি জাতীয় সংহতির ধ্যান-ধারণার বিরোধী। ত্রিপুরার জাতি-উপজাতি বিরোধ, নাগাল্যান্ড, মেঘালয়, মিজোরাম প্রভৃতি বিভিন্ন অঞ্চলে হিংসাত্মক কার্যকলাপ, নাগা, খাসি, গারো, মিজো প্রভৃতি বিভিন্ন পার্বত্য উপজাতিদের রোষ, বৈরিতা এবং স্বাধিকারের আন্দোলন সবই প্রধানতঃ অর্থনৈতিক কারণ থেকেই উদ্ভূত। শোষিত, বঞ্চিত, নিপীড়িত এইসব জাতিগোষ্ঠীর আন্দোলন সঠিকভাবে অর্থনৈতিক শোষণ-ব্যবস্থার বিরুদ্ধে পরিচালিত না-হয়ে হিংসাত্মক পথে জাতি বৈরিতা, বিভেদপ্রবণতা ও বিচ্ছিন্নতার দিকে এগোচ্ছে।

ভারতবর্ষে স্বাধীনতা সংগ্রামের

P29656

যুদ্ধে যে-জাতীয়তাবাদী আদর্শ ও ভাবধারাকে কেন্দ্র করে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ ও পরাধীনতার বিরুদ্ধে সমস্ত দেশবাসী একজাতি একপ্রাণ হয়ে ঐক্যবদ্ধ লড়াই করেছে, দেশ বিভাগের দরুণ সেই ভাবধারা সবচেয়ে বেশী ধাক্কা খেয়েছে। বিদেশী শাসকেরা জাতীয়তাবাদের চেতনার ভাঁটার ধর্মীয় বিদ্বেষ ও সম্প্রদায়িকতার বিষ ছড়িয়ে। ব্রিটিশ শাসকদের সেই ভেদ-নীতির বিষময় পরিণতি কেবলমাত্র জাতীয় ঐক্য নষ্ট করে দেশকে দুই জাতিতত্ত্বের বুলিতে বিভক্ত করেই ক্ষান্ত হয়নি, আজও ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলে সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষের ঘটনার জের অব্যাহত রয়েছে। অতি সম্প্রতি কালে হায়দরাবাদ, আলিগড়, জামসেদপুরে, মোরাদাবাদে বা বিহারে সরীফের বীভৎস সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার ঘটনায় শান্তিপ্রিয় মানুষ আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পড়েছে। জাতীয় ঐক্য ও সংহতিকে বিপন্ন করার এ-এক মারাত্মক ধারার অস্ত্র।

ভাষাগত বিরোধ জাতীয় সংহতির পক্ষে আর একটি সমস্যা। স্বাধীনতার পর ভাষাভিত্তিক রাজ্যপুনর্গঠনের কাজ সম্পন্ন হলেও শিক্ষা ও প্রশাসনের ক্ষেত্রে বিভিন্ন রাজ্যের ভাষাকে এখনও স্বমর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করা হয়নি। হিন্দীকে রাষ্ট্রভাষারূপে মর্যাদা দেবার প্রয়াস অহিন্দী অঞ্চলের ওপর প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছে। এ ছাড়া আঞ্চলিক উপজাতীয় ভাষা, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের ধারাকে বিলুপ্তির মুখে এগিয়ে না দিয়ে বরং তা পুনরুজ্জীবনের মাধ্যমে প্রাণবন্ত করে তোলা এবং প্রতিটি অঞ্চলকে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে শক্তিশালী করে গড়ে তোলাই হবে জাতীয় ঐক্যের সহায়ক। নচেৎ বর্ধীয় সামাজিক, সাংস্কৃতিক অধিকারের প্রশ্নে ভাষা, আঞ্চলিক সীমানা, চাকরি, ব্যবসা-বাণিজ্য, শিল্প-কারখানা, অর্থ-

নৈতিক স্বার্থ প্রভৃতি বিভিন্ন বিষয়কে কেন্দ্র করে অঞ্চলে অঞ্চলে মানুষের মধ্যে বিচ্ছিন্নতার বোধ বৃদ্ধি পাবে।

ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলের সাম্প্রতিক ঘটনাবলীর দিকে নজর রাখলে দেখা যায় যে রাজ্যের অর্থনৈতিক উন্নয়ন, শিল্পবাণিজ্য, অর্থসংস্থানের সুপারিশ ও ধনবণ্টনের নীতি, রাজ্যের হাতে অধিক ক্ষমতা ও গণতান্ত্রিক অধিকারের প্রশ্নে কেন্দ্র ও রাজ্যগুলির মধ্যে দিন দিন সম্পর্ক জটিল হয়ে উঠছে এবং দ্বন্দ্ব বৃদ্ধি পাচ্ছে। এর মূল কারণ নিহিত রয়েছে ধনবাদী শাসন ব্যবস্থা ও কেন্দ্রীয় সরকারের নীতি নির্ধারণের ভেতরে। ধনিক শ্রেণীর শাসননীতি ইংরেজ আমলের ভেদনীতি ও কূটকৌশলের দ্বারা বহুলা প্রভাবিত, জনকল্যাণকর রাষ্ট্রগঠনে ততটা উদ্বুদ্ধ হয়, যদিও সেবোক্ত আদর্শই হল ভারতীয় সংবিধানের অন্বিষ্ট প্রত্যয়। ভারতের রাষ্ট্রকাঠামো যুক্ত-রাষ্ট্রীয় হলেও কেন্দ্রীয় সরকারই সর্বাত্মক ক্ষমতার অধিকারী। অর্থ-বণ্টন, উৎপাদন, বিবিধ উন্নয়নমূলক পরিকল্পনা প্রভৃতি যাবতীয় ব্যাপারে কেন্দ্রীয় কর্তৃত্ব বজায় থাকায় উত্তর অঞ্চলের পাঞ্জাব, হরিয়ানা, রাজস্থান, মধ্যঅঞ্চলের উত্তরপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ, পশ্চিম ভারতের গুজরাট, মহারাষ্ট্র অল্প-বিস্তর সুযোগ-সুবিধা পেয়েছে। কিন্তু সেই তুলনায় দক্ষিণ ভারত ও পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলি অবহেলিত হয়ে এসেছে। এর ফল হয়েছে রাজ্যে রাজ্যে জনগণ ও কেন্দ্রের সঙ্গে বিরোধ। ধর্ম, ভাষা, কর্মসংস্থান, আঞ্চলিক উন্নয়ন ও অর্থনীতি সংক্রান্ত স্বাতন্ত্র্যের দাবি প্রভৃতি বিভিন্ন বিষয়কে নিয়ে উন্নয়নশীল ও অনুন্নত অঞ্চল অর্থাৎ এককথায় প্রায় সারা ভারতেই বিরোধ, অনৈক্য ও অশান্তি ব্যাপক আকারে ছড়িয়ে পড়ছে, যা জাতীয় ঐক্য ও সংহতির পক্ষে মারাত্মক ক্ষতিকারক।

অবশ্য এই বিরোধ ও অনৈক্যই অনগ্রসর ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্র শাসন-ব্যবস্থাকে বজায় রাখার মূলে চাবি-কাঠি। কারণ যে দেশে শতকরা আশীভাগ মানুষ গরিব এবং যেদেশে সমস্ত ধনসম্পদ সৃষ্টিমের কয়েকজন শিল্পপতি ও ধনিক শ্রেণীর হাতে পুঞ্জীভূত, সেদেশে অর্থনৈতিক শোষণ, অসাম্য ও নিপীড়নের বিরুদ্ধে সারা ভারতের শ্রমিক-কৃষক-মেহনতী মানুষ ঐক্যবদ্ধ হয়ে এই ধনতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা উচ্ছেদের সংগ্রামে যেন রতী হতে না-পারে সেইজন্যই বহু জাতি-ধর্ম-বর্ণ-ভাষা ভিত্তিক রাজ্য ও অঞ্চলের মধ্যে বিরোধ ও অনৈক্যই পুঁজিপতিশ্রেণীর বেঁচে থাকার একমাত্র পথ। এইভাবে যতদিন বেঁচে থাকা যায়, যতদিন সেই কল অভ্যুত্থানকে ঠেকিয়ে রাখা যায়, যতদিন শোষণ-ব্যবস্থাকে বজায় রাখা যায়, যতদিন বিভিন্ন প্রগতিশীল আন্দোলনকে ধর্ম-বর্ণ-ভাষার আঞ্চলিক কোশলের ভেতরে সীমাবদ্ধ রেখে মূল সংগ্রামকে বিপথগামী করে দেওয়া যায়, ততদিনই এই ধনবাদী শাসন-ব্যবস্থার লাভ, পুঁজিপতি শ্রেণীর আয়ু।

উচ্চবর্ণ-হরিজন বিরোধ, ধর্মে ধর্মে বিরোধ, বিভিন্ন গোষ্ঠী ও সম্প্রদায়ের মধ্যে বিরোধ, আঞ্চলিক ও রাজ্যে রাজ্যে বিরোধ, জাতিতে জাতিতে বিরোধ, এবং এইপ্রকার বিভিন্ন বিরোধের সুযোগে কিছু কিছু প্রতি-ক্রিয়াশীল শক্তি ও বিদেশী অশুভ চক্রের ধ্বংস বা উৎখাত জাতীয় সংহতি বিনষ্ট করছে। তাছাড়া ধর্ম-বর্ণ-জাতি বা আঞ্চলিক স্বার্থকে কেন্দ্র করে ভারতবর্ষের বিভিন্ন রাজ্যে ভেদনীতির সুযোগে গড়ে-ওঠা কিছু কিছু রাজনৈতিক বা সামাজিক প্রতিষ্ঠানও জাতীয় ঐক্যের সহায়ক নয়।

ধনতন্ত্রের বিকাশ ও অগ্রগতির প্রয়োজনে এক সার্বভৌম রাষ্ট্রশাসন একান্ত অপরিহার্য। অন্যদিকে ধর্ম-বর্ণ-জাতি বা আঞ্চলিক স্বার্থের উর্ধ্বে সারা দেশ জুড়ে শ্রমিক শ্রেণীর ঐক্য-চেতনা ও সর্বহারা শ্রেণীর আন্দোলনকে আরও সম্প্রসারিত করার স্বার্থেই ঐক্যবদ্ধ রাষ্ট্রের প্রয়োজন। উভয়শ্রেণীই জাতীয় ঐক্য ও সংহতির প্রবক্তা। প্রথম পক্ষ পুঁজিতান্ত্রিক শিল্প বিকাশের স্বার্থে এবং অর্থ-নৈতিক শোষণকে জীইয়ে রাখার প্রয়োজনে শ্রমিক ঐক্যবিরোধী ধর্ম-বর্ণ-জাতিভিত্তিকে অবলম্বন করেই জাতীয় ঐক্যের আপ্তবাক্য আওড়ায়, যাতে সামগ্রিক শ্রেণী শোষণের বীভৎস রূপটি শোষিত বঞ্চিত মানুষের নজরে না-পড়ে, যাতে ঐক্যবদ্ধ শ্রমিক আন্দোলনের গতিমুখ বিপথগামী করে দেওয়া যায়। অন্যদিকে শ্রমিক শ্রেণীর সার্বিক ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন প্রসারের স্বার্থেই দ্বিতীয় পক্ষ চায় অর্থনৈতিক শোষণের বিরুদ্ধে ধনতান্ত্রিক শাসন-

ব্যবস্থা উচ্ছেদ করার জন্য জাতীয় ঐক্য ও সংহতি। এই ঐক্য যেন কোনভাবেই ভেদবুদ্ধি, সংকীর্ণতা বা বিচ্ছিন্নতাবাদের কবলে পড়ে বিপথগামী না-হয় দ্বিতীয় পক্ষ সেদিকেও কড়া নজর রাখে। প্রথম পক্ষ চায় শ্রেণীসংগ্রামকে অব্যাহত রাখতে। দ্বিতীয় পক্ষ চায় শ্রেণী সংগ্রামকে ধরাশায়িত করতে। জাতীয় ঐক্য ও সংহতির প্রশ্নে উভয়ের দৃষ্টিভঙ্গি, উদ্দেশ্য এবং পথ সম্পূর্ণ ভিন্ন, বরং পরস্পর বিরোধী।

আধুনিক শিল্পোন্নত ধনতান্ত্রিক সমাজ-ব্যবস্থায় ধর্ম-বর্ণজাতিভিত্তিক এমন কোন বিরোধ বা সংঘর্ষ থাকেনা যা জাতীয় সংহতির পক্ষে ক্ষতিকারক হয়ে ওঠে। কারণ ধনতান্ত্রিক সমাজের শ্রেণীবিভাগের বনিয়াদ এবং শ্রেণী বিরোধ সবই বুর্জোয়া ও সর্বহারা—এই দুই শ্রেণীকে কেন্দ্র করেই, এবং তা কখনও জাতীয় সংহতির পক্ষে ভীতিপ্রদ নয়। কিন্তু ভারতবর্ষে সাম্রাজ্যবাদী ভেদনীতির দরুন ধর্মীয়, সাম্প্রদায়িক ও বর্ণগত বিদ্বেষবোধ এখনও পরিলক্ষিত। ফলতঃ সমাজতান্ত্রিক সমাজ-কাঠামোর দেশের বৃহত্তম অংশে মধ্যযুগীয় মানসপ্রবণতা এখনও পরিব্যাপ্ত, আধুনিক শিল্পবিকাশের ক্ষেত্রে স্বাধীন অগ্রগতি ঔপনিবেশিক ধনতন্ত্রের যুগ থেকেই বাধাপ্রাপ্ত। এইসব কারণে তো বটেই, তাছাড়া স্বাধীনতার পরবর্তীকালে অনুসৃত পুঁজিবাদী অর্থনীতির দুর্বলতা ও শোষণ-চরিত্রকে আড়াল রাখার স্বার্থেই শাসক ধনিক শ্রেণী পুরনো ভেদনীতিকেই বেঁচে থাকার অস্ত্র হিসেবে গ্রহণ করায় সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষ, জাতি ও বর্ণভিত্তিক বিদ্বেষ ও আঞ্চলিক বিভেদ প্রবণতা বৃদ্ধি পাচ্ছে।

অথচ বহু ভাষা জাতি ধর্ম ও আচারসংস্কার বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও বিপ্লবের পর লেনিন সোভিয়েত রাশিয়াকে এক জাতীয়তাবোধে উদ্বুদ্ধ করে ঐক্যবদ্ধ সমাজতান্ত্রিক সোভিয়েত ইউনিয়ন গঠন করেন। চীন দেশেও একই ঘটনা ঘটে বিপ্লবের পর। সেখানেও বহু ভাষা ধর্ম গোষ্ঠী ও জাতির অস্তিত্ব থাকা সত্ত্বেও মাও জে দং-এর নেতৃত্বে চীনদেশে এক শক্তিশালী ঐক্যবদ্ধ রাষ্ট্র গঠন সম্ভবপর হয়েছে। এমন কি অতি আধুনিক শিল্প-বাণিজ্যে উন্নত, জ্ঞান-বিজ্ঞানে প্রাগ্রসর, বিপুল পণ্য-ভোগী ও আধুনিক জীবনযাত্রার অত্যন্ত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রেও একদা বহু জাতি ভাষা ও গোষ্ঠীর অস্তিত্ব ছিল। সেখানেও আজ সমমূল্য সূত্রে এক জাতি হিসেবে ঐক্যবদ্ধ ধনবাদী সম্পন্ন সমাজ ও রাষ্ট্রব্যবস্থা গড়ে উঠেছে।

ভারতবর্ষে ৩৭ বছর পুঁজিবাদী শাসনব্যবস্থা কায়েম হয়েছে, কিন্তু এখনও শিল্প-বাণিজ্যে উন্নত আধুনিক সমাজ গড়ে ওঠেনি। বরং অনগ্রসর ধনতান্ত্রিক সমাজ-কাঠামোর অপসৃয়মান করিক; সামন্ত সমাজের অবশেষ তার ছিটেফোঁটা সংস্কার নিয়ে টিকে আছে। সুতরাং কৃষি ও শিল্পক্ষেত্রে আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতিতে প্রভূত উন্নয়ন এবং প্রগতিশীল চিন্তা-চেতনার উপযোগী শিক্ষা বিস্তারের মাধ্যমে মধ্যযুগীয় সমাজ-মানসের রূপান্তর ঘটাতে হবে। অন্যদিকে কায়েমী স্বার্থ, শোষণ, ধনবাদী সমাজ ও অর্থব্যবস্থা উচ্ছেদের জন্য শ্রমিক শ্রেণীর ঐক্যের ভিত্তিতে শ্রেণীসংগ্রামকে তীব্রতর করে পথ অভ্যুত্থানের দিকে এগিয়ে যেতে হবে। এবং এই পথেই জাতীয় ঐক্যের বিরোধী বিভেদ ও বিচ্ছিন্নতার শক্তিগুলি অপসৃত হবে, জাতীয় সংহতির পথ প্রশস্ত হবে। এ ছাড়া অন্য কোন পথ খোলা নেই।

আর সে-পথে এগোতে গেলে চাই ত্যাগ, নিষ্ঠা ও চারিত্রিক দৃঢ়তা। তত্ত্ব ও প্রয়োগ, জীবন ও বাণীর সমন্বয়ে গড়ে-ওঠা দুর্বার সংগ্রামী চেতনা, সততা ও অনলস প্রয়াস ছাড়া সে পথ খুঁজে পাওয়া যাবেনা। রাজনৈতিক সুবিধাবাদের চিলেকোঠা থেকে কথার ফানুস উড়িয়ে সে পথ খুঁজতে গেলে অন্ধকারে মুখ থুবড়ে পড়তে হবে।

# স্বৈরতন্ত্রের বিরুদ্ধে সংগ্রাম

নারায়ণ চৌধুরী

১৯৫৯ সালে কেরলে নাম্বুদ্রিপাদ সরকারের সংখ্যাগরিষ্ঠতা থাকা সত্ত্বেও কৃত্রিম বিক্ষোভ সংগ্রামের ধুয়া তুলে জোর করে তার পতন ঘটানো, ১৯৬৭ সালে পশ্চিমবাংলায় যুক্তফ্রন্ট সরকারের শাসনকালে কেন্দ্র-নিযুক্ত ধলাল রাজ্যপাল ধর্মবীরের দ্বারা অজয়-মন্ত্রিসভার বরখাস্তকরণ ঘটিয়ে কংগ্রেসের সঙ্গে গোপনে চক্রান্ত করে যুক্ত ফ্রন্টের পৃষ্ঠপোষণে বিশ্বাসঘাতকের ন্যায় ছরিকাঘাতকারী গান্ধীবাদের ভেকধারী ডক্টর প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষের ১১-জন সদস্যবিশিষ্ট সংখ্যালঘু পি, ডি, এফ, দলকে মন্ত্রিত্ব অভিষিক্ত করা, ১৯৭১ সালের নির্বাচনে সি, পি, এম দলের একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন সত্ত্বেও তাকে মন্ত্রিসভা গঠন করতে না ডেকে রাজ্যপাল ধাওয়ানের' কংগ্রেসকে মন্ত্রিসভা গঠনে আহ্বান জানানো, তার পর বিভিন্ন সময়ে পরে পরে হরিয়ানায় বনসীলাল রাজ্যপাল তাপাসের সর্বপ্রকার শোভনতা ও সাংবিধানিক ঔচিত্যের মাথায় মুগুর মেরে জনতা-দলের নেতা দেবীলালকে মন্ত্রিসভা গঠন করতে আহ্বান না জানিয়ে ভজনলালের সংখ্যালঘু কিন্তু ঘোড়া কেনাবেচার দ্বারা পুষ্ট কংগ্রেস দলকে মন্ত্রিসভা গঠনের সুযোগদান, সিকিমে রাজ্যপাল তাসিরারখান কর্তৃক ব্যক্তিগত আক্রোশের বশে দুর্নীতির কাল্পনিক অভিযোগে সংখ্যাগরিষ্ঠতা সত্ত্বেও নরবাহাদুর ভাণ্ডারীর কংগ্রেস মন্ত্রিসভার উৎখাতকরণ, কাশ্মীরে দিল্লীর চামচা রাজ্যপাল জগমোহনের দ্বারা ফারুক আবদুল্লার নেতৃত্বাধীন ন্যাশনাল কনফারেন্স দল চালিত মন্ত্রিসভার উচ্ছেদ সাধন, সর্বশেষে অন্ধ্রের আরেক চামচা রাজ্যপাল রামলাল কর্তৃক তেলেগু দেশমের সর্বস্বীকৃত নেতা এন, টি রামারাওয়ের নেতৃত্বচালিত সংখ্যাগুরু মন্ত্রিসভার বলপূর্বক উচ্ছেদ ঘটিয়ে তার জায়গায় বিশ্বাসদ্রোহী ক্ষমতা-লোভী এক ভাস্কর রাওকে সংখ্যা-লঘু জেনেও মন্ত্রিত্বে অধিষ্ঠিতকরণ-এ সব কয়টি ঘটনার পিছনেই একটা ছক লক্ষ্য করা যায়। সে ছকটি হলো, যে সরকার আমার পছন্দ নয়, আমার সর্বময় কর্তৃত্বের বিরুদ্ধে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে এই রাজ্যে কি ওই রাজ্যে যেন আমাকেই ব্যঙ্গ করবার জন্য অবস্থিতকর রূপে বিদ্যমান —তাকে ছলে বলে হোক কৌশলে হোক উৎখাত করলে কোন দোষ হয় না। ছলের মধ্যে আছে ঘোড়া কেনাবেচার সুযোগ দান ও জেনেশুনে মিথ্যা কথা বলা (যেমন অন্ধ্রের ঘটনার পর লোকসভায় প্রধানমন্ত্রীর নির্দোষিতার সাফাই গেয়ে বিবৃতি দান) বলের মধ্যে প্রয়োজন হলে নেতাদের গিরেফতার করে আটকে রাখা, কৌশলে বলতে পররাষ্ট্রের সঙ্গে যোগসাজস, উগ্রপন্থীদের মদদ দেওয়া জাতীয় নানাবিধ বানানো অভিযোগ লেপকরণ, ইত্যাদি।

এবং আরও যেটা লক্ষ্য করবার বিষয়, প্রত্যেকটি ক্ষেত্রেই কুকর্মের নায়িকা হলেন শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী, যার হাতে কেন্দ্রের তাবৎ ক্ষমতা মাত্রের তিনটি বছর (১৯৭৭-৭৯) বাদ দিলে একটানা ষোল বছর যাবৎ কেন্দ্রীভূত। পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু সতেরো বছর একটানা কেন্দ্রীয় শাসনের তক্তে গদীয়ান ছিলেন আর কন্যা পিতৃদেবের পদাঙ্ক অনুসরণ করে একইরূপ নিরঙ্কুশ ক্ষমতা-লিপ্সার দ্বারা ঘেরে চলেছেন। জওহর-লালজীর শাসনের বন্ধনের ভিতর তবু যা হোক গণতন্ত্রের একটা ঠাট ছিল কিন্তু তাঁর কন্যার সে বালাই নেই। ইনি জানিয়ে শুনিয়েই স্বৈরতন্ত্রের ধ্বজাধারিণী এবং গণতন্ত্রের সংহারিণী। উপরন্তু বংশানুক্রমিক উত্তরাধিকার তত্ত্বের অনবচ্ছ প্রচারের দ্বারা আধুনিক রাষ্ট্রনীতির ধ্যান-ধারণার বদলে তার জায়গায় মধ্যযুগীয় ধ্যান ধারণা প্রতিষ্ঠার নিতান্ত অনুচিতভাবে রতিনী। এক পুত্র অপঘাতে মারা গিয়েও তাঁর শিক্ষা হয়নি, অন্য পুত্রকে ইদানীং একই উদ্দেশ্যে রাজনীতির ক্ষেত্রে আমদানী করেছেন এবং তাকে ইন্দিরা-শাহীর দ্বারক্ষী হিসাবে অনিচ্ছুক দেশবাসীর উপর চাপিয়ে দিতে চাইছেন। ইংরাজীতে যাকে বলে 'ডাবল-স্পিক' সেই দ্বি-ভাষণের তিনি এক জলন্ত প্রতিমূর্তি'। অসততার ও মিথ্যাচারিতার একটি মোক্ষম নমুনা-দৃষ্টান্ত হিসাবে তাঁকে খাড়া করলেও বুঝি অন্যায় হয় না। উপরে বর্ণিত ঘটনাবলীর পিছনে তাঁর হাতের দ্বারা

অনুষ্ঠান করেও তাঁর অন্যান্য কার্যকলাপ দৃষ্টে এখন কথাও যদি বলা যায়, দেশব্যাপী যাবতীয় দুর্নীতির তিনি হলেন মূল উৎস—তাহলেও বুঝি সেটা অতিরঞ্জন হয় না। ভারতের সমাজ ও রাষ্ট্র জীবনের সর্বস্তরে অধুনাতন কালে দুর্নীতির যে অনিয়ন্ত্রিত বন্যাস্রোত বয়ে চলেছে খতিয়ে দেখলে দেখা যাবে, তার মূলে কেন্দ্রীয় শাসক শক্তির নেপথ্যভূমিকা একটি বড় স্থান জুড়ে আছে এবং তারও কেন্দ্রমূলে রয়েছেন আরেকজন—প্রাক্তনী ইন্দিরা গান্ধী। অ-কংগ্রেসী সরকারগুলির বারাবাহিক উচ্ছেদ ও উৎসাদন তাঁরই প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ সহায়তায় নিষ্পন্ন—এ বিষয়ে কোন সংশয়ই থাকতে পারে না।

## সংসদীয় গণতন্ত্রের ব্যর্থতা

কিন্তু ইন্দিরা গান্ধীর বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণার জন্য আজকের এই প্রবন্ধ ফাঁদিনি। আমার এ রচনার অভিপ্রায় সম্পূর্ণ ভিন্ন। সেই অভিপ্রায় হলো, এটা দেখাতে চাওয়া যে সংসদীয় গণতন্ত্রের এক্সপেরিমেন্ট ভারত রাষ্ট্রে সম্পূর্ণ ব্যর্থ প্রতিপন্ন হয়েছে। এই রাজার চলে আর বিশেষ লাভ হবে না ভারতের। অবশিষ্ট সাধারণ মানুষের যদি যথার্থ কল্যাণ সাধন করতে হয় তাহলে আমাদের ভিন্ন কোন পথের দিশা খুঁজে বার করতে হবে। কী সেই রাস্তা তার আলোচনার পরে আসছি, আপাতত দেখা যাক সংসদীয় গণতন্ত্রের সত্যিকারের চেহারাটা কী। গত সত্তরের দশকে এ বিষয়ে এত বিস্তৃত প্রমাণ হাতে জমা হয়েছে যে, তামা-তুলসী হাতে নিয়েও যদি কেউ সংসদীয় গণতন্ত্রের পবিত্রতায় আস্থা ঘোষণা করতে চান ও বারংবার শপথের হলফে তার দোহাই পাড়েন, তাহলেও এর কার্যকারিতায় লোকের প্রত্যয় জন্মবে কিনা সন্দেহ।

ঘটনার শুরু কিন্তু কেরালার সংখ্যাগরিষ্ঠ আসনশক্তির জোরে গঠিত কম্যুনিস্ট মন্ত্রিসভার বলপূর্বক উচ্ছেদ সাধনে নয়; তার আগেই এই খেলা আরম্ভ হয়ে গিয়েছিল। উদাহরণ, রাজ্য বিধানসভায় খিড়কি দুয়ার দিয়ে চোরাগোপ্তা রাজ্যপালটাকে ঢুকিয়ে নিতান্ত অন্যায্যভাবে তাঁকে কংগ্রেস দলীয়সভার মুখ্যমন্ত্রিত্বে অভিষেক করা হয়েছিল। ব্যাপারটা নীতিগতভাবে তার মনঃপূত না হলেও রাজ্যপাল শ্রীপ্রকাশের এই নাটকের অসহায় কুশীলবের ভূমিকা পালন করা ছাড়া গত্যন্তর ছিল না। কেননা কেন্দ্রের অভিপ্রায়ের অন্যথাচরণ করলে নেহরুর বিরাগভাজন হওয়ার ভয় ছিল, চাই কি পদচ্যুত হওয়াও অসম্ভব ছিল না। এর কয়েক বছর পরে বাপে-খেদীতে বুদ্ধি করে কেমন করে কেরালায় বৈধ সরকারকে উৎখাত করিয়ে গণতন্ত্রের বারোটা বাজিয়ে দেওয়া হয়েছিল সে ইতিহাস এতই সুবিদিত যে, এখানে তার বিস্তারিত বর্ণনের প্রয়োজন করে না। শুধু নাম্বুদিরিপাদ সরকারের সমর্থকদল নয় কংগ্রেস সংগঠনেরও একাধিক ন্যায়নিষ্ঠ ব্যক্তি এবং বিরুদ্ধ মতাবলম্বী। খোদ মানুষ তখন এই ঘটনার সম্পর্কে ঘোষ করেছিলেন। সেই যে সংসদীয় গণতন্ত্রের সার্বভৌমত্বের সংস্কারের বীজ ন্যায়বান ব্যক্তিদের মনে উপ্ত হয়েছিল তা আর মুছে যায়নি বরং বিপরীত ঘটনার উদাহরণ জমে জমে তালজঙ্ঘে এতই পাহাড় প্রমাণ হয়ে উঠেছিল যে সেই বীজ আজ প্রকাণ্ড বিষবৃক্ষে রূপান্তরিত হয়েছে। তাকে গোড়াসুদ্ধ উপড়ে না ফেললে আর রক্ষা নেই—ভারতের দীর্ঘদিনের প্রশ্নের হলাহলের ভয়াবহ ঘটবে।

অনেক দুঃখে এ কথা বলছি। কেন বলছি তা একটু পর্যালোচনা করে দেখা যাক।

## নির্বাচনের প্রহসন

১৯৫০ সালে ভারতের সংবিধান রচিত ও তদনুযায়ী দেশটি প্রজাতন্ত্র রূপে ঘোষিত হওয়ার পর থেকে এ পর্যন্ত সাধারণ পূর্ণমেয়াদী নির্বাচন ও মধ্যবর্তী নির্বাচন এই দুই খাতে মোট করেও আটটি নির্বাচন হয়েছে। বিধান সভার নির্বাচন সমূহের কথা বাদই দিলাম। এই নির্বাচনগুলির হিসাব নিলে দেখা যাবে, এগুলিকে কেন্দ্র করে টাকার খেলা দিন দিন বাড়ছে। দুর্নীতির পরিমাণ ক্রমবর্ধমান, মিথ্যাচার ও অসদাচরণের ঠাসবুনন জমিতে সতের পা রাখবার এতটুকু জায়গা কোথাও অবশিষ্ট নেই। নির্বাচন মানেই টাকার গোপন লেনদেন, ভোটার বাগানো ও জোগানোর চেষ্টা, নির্বাচনের প্রাক্কালে নানাবিধ আর্থিক সুবিধা সুযোগের ঢালাও ব্যবস্থাদির দ্বারা কার্যতঃ ঘুষের বান ডাকিয়ে দেওয়া, মোটা টাকা চাঁদার বিনিময়ে বড় বড় ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানগুলিকে নানান কিছু পাইয়ে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দান এবং

ক্ষমতায় এসে সে সবের কার্যকরণ, আরও কত কী।

সব প্রক্রিয়া আমাদের মত অধ্যাপারীর ঠিক জানাও নেই, জানবার কথাও নয়। এ সবের সঠিক সন্ধান তাঁরাই বলতে পারবেন যাঁরা এই সব ক্রিয়া-কলাপের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে সম্পৃক্ত আছেন এবং সেই সুবাদে এ কাজের যাবতীয় প্রয়োজনীয় কলা কিকির যাদের নখ-দর্পণে রয়েছে। আমরা বাইরের লোক ভিতরে কী ঘটে না ঘটে তা কেমন করে অনুমান করব।

নির্বাচনী অভিযান চলাকালীন নানাবিধ সন্দেহজনক কাণ্ডকারখানা তো আছেই, তার ফিরিস্তি দিতে গেলে তাতেই পুঁথি যথেষ্ট বেড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা তার উপরে। ভোটগ্রহণ পর্ব অনুষ্ঠানের সময় যেসব কেলেঙ্কারি হয় তার বিবরণ দিতে গেলে একটা পুঁথিতে কুলবে না, কয়েকখানা পুঁথির দরকার। তবু সংক্ষেপে সে সবের তালিকা এই রকম—রিগিং, জোর করে বুথকে-বুথ দখল করে নেওয়া, প্রিসাইডিং অফিসারকে ভীতি প্রদর্শন ও হুমকির মুখে তাঁকে দিয়ে কাজ হাসিল করিয়ে নেওয়া, বেনামধারী ভোটদান এবং একই ব্যক্তির উপর্যুপরি ভোটদান, বুথের এলাকায় পরিকল্পিতভাবে মারদাঙ্গা ঘটিয়ে ও বোমা-পিস্তল-রিভলবার আমদানী করে সাধা ভোটদাতাদের ভোটদানকেন্দ্র থেকে হটিয়ে দেওয়া, গ্রামাঞ্চলের ও শহরাঞ্চলের বাছা এলাকায় অশিক্ষিত ভোটদাতাদের শিখিয়ে পড়িয়ে ব্যালট পেপারের একটি ঘর আড়ংগ্রস্ত প্রার্থীর ঘরে চুপ-চিহ্ন লাগানোর জন্য যা-যা করা দরকার তার সবই করা, বিভিন্ন দলীয় পোলিং এজেন্টদের নিজ নিজ দলের পক্ষে পক্ষপাতী আচরণ, ইত্যাদি ইত্যাদি।

বলা হবে এগুলি তো সব ব্যক্তি-ক্রমমূলক ঘটনার দৃষ্টান্ত, ব্যক্তিক্রমী দৃষ্টান্ত যতই গর্হিত হোক তার প্রয়োগ সীমিত ক্ষেত্রেই হতে দেখা যায়। তা দিয়ে কি একটা রাজ্যের যন্ত্রের মত প্রকাণ্ড ভোট যন্ত্রের কর্মকাণ্ডের বিচার হওয়া উচিত, কতক গুলি ছাড়া-ছাড়া বিচ্ছিন্ন বিসদৃশ ঘটনার নজীরে গোটা নির্বাচন অভিযানকে নাকচ করতে চাওয়ার মনোভাব কি সমর্থনযোগ্য? অংশের অপরাধে সমগ্রের উপর নির্মম হওয়া কি যুক্তিযুক্ত?

মানলাম এই যুক্তির মধ্যে অনেক-খানি সত্য আছে। বাস্তবিকই তো, টুকরা-টুকরা ঘটনার বিসদৃশতার মানদণ্ডে গোটা বস্তুর মূল্যায়ন হওয়া বাঞ্ছনীয় নয় বা সে সম্বন্ধে বিরূপ রায়দান অকর্তব্য। সারা ভারত জুড়ে এত বড় একটা বিশাল কর্ম-কাণ্ডের উদ্‌যাপন নিয়ে যেখানে কথা সেখানে এখানে-সেখানে গোলযোগ তো কিছু হতেই পারে। তা বলে নির্বাচন ব্যাপারটাকেই দোষাবহ মনে করার কী থাকতে পারে?

তা যেন হলো, কিন্তু নির্বাচনী পর্ব নিষ্পন্ন হওয়ার পর থেকে নতুন যে পালার শুরু হয় তার কি? সেই কথাতেই এখন আসছি।

## নির্বাচনোত্তর পরিস্থিতি

সত্যি কথা বলতে কি, নির্বাচনের পরেই আসল খেলার শুরু। এটা কী লোকসভা কী বিধানসভা দুই ক্ষেত্রেই সমান প্রযোজ্য। বোধহয় বিধানসভার বেলাতেই বেশী প্রযোজ্য। কেননা সেখানেই ঘনঘন এই 'আয়ারী কা খেল'-এর অনুষ্ঠান হতে দেখা যায়। যথা, মন্ত্রিসভা গঠনকালে ঘোড়া-কেনাবেচা ব্যবসার চালাও তৎপরতা, আয়ারাম-গয়ারামদের উপর্যুপরি কোট-পরিবর্তন, শ্যামবাবু আজ যদি জনতা দলে আছেন তো কাল তাঁকে দেখা যাবে ইন্দিরা কংগ্রেসের দলে, রহিম সেখ দিনের বেলায় যদি থাকেন তো মুসলিম লীগের শিবিরে তো রাতারাতি তাঁকে দেখা যাবে শিবির বদলিয়ে মুসলিম মজলিসের আস্তাবানায় ভীড় পাড়তে, এই রকম একদল থেকে অন্যদলে ঘনঘন শিবির বদল লেগেই আছে—দলীয় নাম-নিশানা পাল্টে শিবির থেকে শিবিরান্তরে আনাগোনা যেন স্বাধীনতা-উত্তর ভারতের রাজনীতির একটা নিত্য-নৈমিত্তিক পর্ব হয়ে দাঁড়িয়েছে এমনই নির্মমিত এ-ঘটনার চক্রাকার আবর্তনশীলতা।

বলা বোধহয় নিষ্প্রয়োজন যে এসব কিছুরই মূলে আছে প্রলো-ভনের কাঁদে ফেলে শিকার বাগানের এক মস্ত বেপথ্য ক্রিয়া। প্রলোভন কখনও মোটা টাকার অঙ্কে, কখনও মন্ত্রিত্বপদের টোপের আকারে, কখনও অন্য কোন লোভনীয় প্রাপ্তির আশ্বাসবেশে। কিন্তু প্রলোভন বস্তুটির অস্তিত্ব সম্পর্কে কিছুমাত্র ভুল করার যো নেই। কর্নাটক বিধানসভার জনতা বিধায়কদের ভাঙানোর জন্য ইন্দিরা কংগ্রেসের পক্ষ থেকে টাকা ছড়াবার চেষ্টার কেলেঙ্কারী ইদানীং 'মরলী টেপ'-এর ঘটনায় মধ্যে

চিরকালের জন্য কৃখ্যাত হয়ে রইলো। এই প্রসঙ্গে কংগ্রেসের অন্যতম জেনারেল সেক্রেটারী একাধিক নাটকীয় ভাবনের যাঁর নায়ক প্রয়াত স্টীফেন সাহেবের নির্লজ্জ উক্তি আজও অনেকের স্মরণ থাকতে পারে। তিনি সংকোচের পর্দা কিছুমাত্র না রেখে বলেছিলেন, কর্ণাটকে জনতা মন্ত্রিসভা যখন সংখ্যালঘু দলের এক মন্ত্রিসভা অন্য দলের সমর্থনের উপর দাঁড়িয়ে আছে, তখন ওই দল থেকে যে কোন উপায়ে বিধায়ক ভাঙ্গানোর অধিকার কংগ্রেসের আছে। স্টীফেনের এই ব্রীড়াহীন উক্তি থেকে বোঝা যায় ইন্দিরা কংগ্রেস নীতির মানদণ্ডে আজ অবঃপতনের কোন পর্যায়ে এসে দাঁড়িয়েছে। অন্যায়ের সমর্থনে এমন চাঁচাছোলা বাহবাস্ফোট সেই কয়তে পারে যার ন্যায় অন্যায় বোধ সম্পূর্ণ লোপ পেয়ে গিয়েছে এবং দু'কান কাটার মত রাজার মাঝখান দিয়ে চলার লজ্জাহীনতায় যার কিছু এসে যায় না।

কিন্তু এ তো গেল বেশ কিছুকাল আগেকার ঘটনা। সাম্প্রতিক কালে অন্ধ্রে খেলায় আমরা কী দেখতে পাচ্ছি। বিধান সভায় সংখ্যাগরিষ্ঠতা থাকা সত্ত্বেও অন্যায়ভাবে উৎখাত এন টি রামা রাওয়ের অনুগত তেলেগু দেশম-এর বিধায়কদের অবস্থাটা কী? পাছে কংগ্রেসের মদদপুষ্টো 'বিশ্বাসহন্তা' ভাস্কর রাওয়ের চর-উপচরেরা ভজানোর মতলবে তাঁদের নাগাল ধরতে না পারে তার জন্য তাঁদের এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায়, এক রাজ্য থেকে অন্য রাজ্যে "নিরাপদ আশ্রয়ে" ঘুরিয়ে বেড়ানো হচ্ছে। খবরের কাগজে প্রকাশ্যে লেখা হচ্ছে টাকার থলে নিয়ে কংগ্রেস দলের চাঁইরা রাজভবনের নেপথ্যে সাগ্রহে অপেক্ষা করছেন কখন টোপ গেলার খবর আসে আর টাকা বের করে দিতে হয়। খুনে ডাকাতের মাথার উপরে দাম ধার্য করার মত এক-এক জন বিধায়কের দাম ধরা হচ্ছে দশ লক্ষ, পনের লক্ষ, সর্বশেষ খবরে পঁচিশ লক্ষে নাকি দামটা উঠেছে।

কী লজ্জা। কী লজ্জা। গোটা ব্যাপারটা এমন ন্যক্কারজনক যে, এই নিয়ে বাগবিস্তার করলেও কলম সংকুচিত হয়ে আসে। জনগণের ভোটে নির্বাচিত বিধায়কেরা বিধায়ক তো নয়, যেন সব ক্রয়-বিক্রয়যোগ্য


# অমৃতবাজার পত্রিকা
# যুগান্তর
# এবং অমৃত-র

*শারদীয় অভিনন্দন*

*ও শুভেচ্ছা*

পদ্ম। লজ্জাটা এই কারণেই শুধু নয় যে, এ দল বা ও দল তাদের টাকা দিয়ে কিনতে চাইছে, লজ্জাটা এই কারণেই আরও বেশী যে, তারা সব ভুয়োবোদা বস্তু এই ধারণা তারা নিজেরাই সৃষ্টি হতে দিচ্ছেন তাদের আচরণের মাধ্যমে। অর্থাৎ ভাবখানা এই যে, আমরা সব টোপ গেলার জন্য প্রস্তুত হয়ে ব'সে আছি, যে-যত বেশী লোভনীয় 'চার' দিয়ে টোপ তৈরী করবে তার বড়শীতেই আমরা গাঁথা পড়তে হাত ঘুরে বসে আছি। অর্থাৎ কিনা আমরা সব নিলামের মাল, যে যত বেশী ডাক চড়াতে পারবে তারই কেনা সামগ্রী আমরা। ব্যক্তির ব্যক্তিত্বের পক্ষে এর চেয়ে আর অবমাননাকর অবস্থান আর কী হতে পারে জানি নে।

এইখানে একটা কথা বলব, যা রামা রাওয়ের পক্ষীয়দের কাছেও কিঞ্চিৎ অরুচিকর ঠেকতে পারে। কিন্তু আমি নাচার। সত্য বটে অন্ধ্রের সাম্প্রতিক পরিষদীয় নাট্যলীলার ন্যায় পুরোপুরি রামা রাওয়ের দিকে এবং অন্ধ্রের পদত্যাগী রাজ্যপাল রামলালের অনুষ্ঠিত কুকীর্তির কোন তুলনা হয় না কিন্তু সংসদীয় গণতন্ত্রের রূপায়ণের ক্ষেত্রে এমন অবস্থার সৃষ্টি কেন হবে যাতে প্রথমে রাজ্যপালের কাছে পরে এমন কি রাষ্ট্রপতির কাছেও অনুগত বিধায়কদের গণপরীক্ষে 'প্যারেড' করানো ছাড়া গত্যন্তর দেখা যাবে না। যে মুখ্যমন্ত্রীর পক্ষীয় বিধায়কদের সংখ্যাগরিষ্ঠতার সংশয় প্রকাশ করা হচ্ছে তাঁর হাজির করা তালিকাই কি এ ক্ষেত্রে যথেষ্ট বলে বিবেচিত হওয়া উচিত নয়? তাকে কেন আরও বেশী একটা প্রমাণ দেখাতে বাধ্য করা হবে? আনুষ্ঠানিক প্রমাণ, পাথুরে প্রমাণ? তাহলে আর ব্যক্তির বিশ্বস্ততার কী মূল্য থাকে? সত্যবাদিতা সেক্ষেত্রে নিতান্ত কথার কথা হয়ে দাঁড়ায় নাকি?

রাজনীতিতে অন্তত রামায়ণী-সুলভ সত্যনিষ্ঠার কেউ মূল্য দেয় না, তা বলে ন্যূনতম সত্যনিষ্ঠারও আদর রাজনীতিতে থাকবে না, এ কেমন কথা? রাজ্যপাল বা রাষ্ট্রপতির কাছে ভেড়ার পালের মত বিধায়কদের প্যারেড করানো ছাড়া যদি স্বপক্ষীয় সংখ্যাগরিষ্ঠতা প্রমাণের আর কোন উপায় না থাকে তাহলে বলব, সংসদীয় গণতন্ত্র এ দেশে একটা প্রচণ্ড কৌতুককর ব্যাপারে পর্যবসিত হয়েছে, তার মর্যাদা ধূলিলুণ্ঠিত হয়েছে। ব্যক্তির মর্যাদা যেখানে সুরক্ষিত নয় সেখানে গণতন্ত্রের মতবিধ লোক দেখানো আড়ম্বরবহুল বাইরের ঠাট দেখানোর কী লাভ?

অবশ্য এই যে প্রথম রাষ্ট্রপতির কাছে সংখ্যাগরিষ্ঠতা প্রমাণের উদ্দেশ্যে বিধায়কদের গণপরীক্ষে হাজির করা হলো তা নয়, এর আগেও এমনতর অবিশ্বাস্য ঘটনা ঘটেছে। ষাটের দশকে রাজস্থানের রাজ্যপাল সম্পূর্ণানন্দ একক সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতা হিসাবে কংগ্রেসের মোহনলাল সুখাড়িয়াকে মন্ত্রিসভা গড়বার সুযোগ দেন। রাজ্যপালের এই আদেশকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে বিরোধী পক্ষের নেতা মহারাওয়াল লক্ষ্মণ সিং তাঁর দলীয় সদস্যদের পক্ষে সংখ্যাগরিষ্ঠতার প্রমাণের জন্য তাঁদের সবাইকে নিয়ে খোদ দিল্লীতে এসে উপস্থিত হন এবং তাঁদের রাষ্ট্রপতি রাধাকৃষ্ণনের সমক্ষে হাজির করেন। তাঁদের পক্ষে সংখ্যাগরিষ্ঠতার একটা প্রমাণ থাকা সত্ত্বেও সম্পূর্ণানন্দের একজন বশংবদ রাজ্যপালের মত ওই প্রমাণ মেনে নিতে অস্বীকৃত হন, ফলে অচিরে রাজস্থানে রাষ্ট্রপতির শাসন জারী হয়। আসলে ওই রাষ্ট্রপতি শাসন জারীর প্রকৃত উদ্দেশ্য ছিল বিপক্ষ দলের সদস্য ভাঙিয়ে নিজ পক্ষে সংখ্যাগরিষ্ঠতা আদায়ের জন্য সুখাড়িয়াকে প্রয়োজনীয় সময়ের সুযোগ করে দেওয়া। সম্পূর্ণানন্দও এটা চাইছিলেন। যা-ই কংগ্রেসের পক্ষে কারচুপির সাহায্যে সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ হলো অমনি কেন্দ্রের আজ্ঞাবহ রাজ্যপাল সুখাড়িয়াকে মন্ত্রিসভা গড়তে ডাকলেন। স্বল্পকালস্থায়ী রাষ্ট্রপতি শাসন জারীর আসল অভিসন্ধি দিবালোকের মত স্পষ্ট হয়ে উঠলো।

## অতঃকিম?

কাজেই দেখা যাচ্ছে এ দেশে তথাকথিত সংসদীয় গণতন্ত্রের অসারতা ইতিমধ্যে নিঃসংশয়রূপে প্রমাণিত হয়ে গেছে। শুধু তার শূন্যগর্ভতাই প্রমাণিত হয়নি, তার অপার অনিষ্টকারিতাও প্রমাণিত হয়ে গেছে। বোঝা গেছে এ জিনিস চলতে থাকলে দুর্নীতির পরিমাণ দিনে দিনে আরও বাড়বে, মানুষের মান-সম্মানের আর লেশও থাকবে না। জনগণের প্রতিনিধিত্ব করার সুযোগদানের ছদ্মবেশে সংসদীয় গণতন্ত্র কার্যতঃ জনগণের অধিকার হরণের

একটি কৌশলী প্রকরণ মাত্র। এই ব্যবস্থায় জনসাধারণের সত্যিকারের প্রতিনিধিরা নির্বাচিত হওয়ার আগেই কোন সুযোগ পান না; কেননা প্রতিনিধি মনোনয়ন থেকে শুরু করে নির্বাচনী অনুষ্ঠান, মন্ত্রিসভা গঠন, মন্ত্রিসভার ভাঙাগড়া প্রভৃতি যাবতীয় কাজ ও অকাজ এখানে দলীয় পক্ষপাতের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় এবং সেই নিয়ন্ত্রণে অর্থের শক্তি হয় অত্যন্ত প্রবল। অর্থক্ষমতা প্রয়োগের সুযোগ যে দলের যত বেশী সে দলের তত রমরমা। বলাই বাহুল্য, পরিবেশ যেখানে অর্থের এই অপরিমিত অপব্যবহারের দরুণ গণতন্ত্রের আদর্শ পদে পদে লাঞ্ছিত। অর্থবানেরাই এই সমাজের যাবতীয় রাজনৈতিক ক্ষমতা অন্যায়ভাবে কুক্ষিগত করে রেখেছে। এঁরাই এই সমাজের প্রকৃত ভাগ্য-নিয়ন্তা, সংসদীয় গণতন্ত্র এরূপ ক্ষেত্রে প্রহসন ছাড়া আর কী হওয়া সম্ভব?

সুতরাং ভারতীয় রাজনীতির অনুষঙ্গে সংসদীয় গণতন্ত্রের অন্তঃসারশূন্যতা ও অপদার্থতা যখন প্রমাণিত সত্য, তখন নিছক অভ্যাসের বশে এই পথ আঁকড়ে ধরে থেকে কী লাভ? সংসদীয় গণতন্ত্রের মোহ ত্যাগ করে আমাদের জন্য কোন বিকল্প পথের সন্ধান করা কি উচিত নয়? কী সেই বিকল্প পথ, যা আমাদের মনশ্চক্ষে এই মুহূর্তে প্রতিভাত হয়ে ওঠা স্বাভাবিক?

## বিকল্প পথ

আমার মনে হয়, সংসদীয় গণতন্ত্রের যাবতীয় কলুষ ও অবক্ষয় জনিত অন্যায়ের প্রতিকার হিসাবে ভারতের সামনে দুটি বিকল্প পথ খোলা আছে। এক, রক্তাক্ত বিপ্লবের পথ, দুই, গান্ধী নির্দেশিত অহিংস সত্যাগ্রহের পথ। ভারতের জনগণের সত্যিকারের কল্যাণ সাধন করতে হলে ও তাদের দুর্ভোগ অপসারণের পাষাণ ভার থেকে মুক্ত করতে হলে এই দুই রাস্তার একটি গ্রহণ ছাড়া অন্য গত্যন্তর নাই। রক্তাক্ত বিপ্লবের রূপ-রেখা মোটামুটি ইতিহাস বিধৃত, রুশদেশে, চীনদেশে, রাশিয়ায়, এবং ইদানীং অন্য দু-একটি লাটিন আমেরিকার দেশে এর কার্যকরতা প্রতিষ্ঠিত হয়ে


# পশ্চিমবঙ্গ ক্ষুদ্রশিল্প নিগম লিঃ

৬এ, রাজা সুবোধ মল্লিক স্কোয়ার। কলিকাতা—১২

ক্ষুদ্রশিল্পে রেজেস্ট্রীকৃত উৎপাদনকারী সংস্থাসমূহ অতিসহজেই পশ্চিমবঙ্গ ক্ষুদ্রশিল্প নিগমের মাধ্যমে নিজ কারখানায় উৎপাদিত দ্রব্যাদি ন্যায্যমূল্যে বিক্রয়ের সুযোগ গ্রহণ করতে পারেন। বিশেষতঃ কাঠ ও লোহাজাত আসবাব পত্র, কাগজ, প্লাস্টিক ও এলুমিনিয়াম ইউটেনসিলস, টিউবওয়েল হ্যান্ডপাম্প এ্যান্ডহেলকপ্টার, ফিসিংহুকস, কি, আই ব্যাকেট প্রভৃতির প্রস্তুতকারী ইউনিট সমূহকে অতিসত্বর নিম্ন ঠিকানায় যোগাযোগের জন্য আহ্বান জানানো যাচ্ছে।

মার্কেটিং ম্যানেজার
পশ্চিমবঙ্গ ক্ষুদ্রশিল্প নিগম
শিল্পভবন। ২ ও ৩ নং র‍্যাকমার্ল লেন
(তৃতীয়তল) টেরিটি বাজার। কলি—১২

দেছে। কিন্তু গান্ধী-প্রবর্তিত অহিংস অসহযোগের পথে সমাজ-পরিবর্তনের কার্যক্রম এখনও ব্যাপক-ভাবে পরীক্ষিত হয়নি। এই পরীক্ষা হওয়ার যথেষ্ট অবকাশ আছে।

সত্যাগ্রহের সংগ্রাম পদ্ধতির অনেক সীমাবদ্ধতা আছে সন্দেহ নাই কিন্তু তার পক্ষে একটা বড় বলবার কথা এই যে, তা রক্তপাতের পথ এড়িয়ে অথবা লোকক্ষয় নিয়ন্ত্রণ করে এবং সমাজকে কমবেশী হিংসা-মুক্ত রাখতে সাহায্য করে। গান্ধী-জীর জীবদ্দশায় দক্ষিণ আফ্রিকায়, ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলন কালে, আমেরিকার মেয়রা-প্রচারিত "নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধের" অঙ্গ প্রত্যঙ্গে, টল-স্টয়ের অহিংস পথে অন্যায়ের প্রতি-রোধে, ক্রীশ্চিয়ান কর্মীদলের মেয়ে-কায়দের অসহযোগ নীতিতে এবং সাম্প্রতিক কালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নিগ্রো নেতা মার্টিন লুথার-কিং (জুনিয়র)-চালিত নাগরিক অধিকার সংরক্ষণ আন্দো-লনের পদ্ধতি-প্রকরণের ভিতর সত্যাগ্রহের কিছু কিছু সার্থকতা আমরা দেখেছি, তবে তা প্রয়োজনের তুলনায় যথেষ্ট নয়। এই পথে আরও পরীক্ষা নিরীক্ষার স্পষ্টই সুযোগ রয়েছে। বিশেষতঃ ভারতের মত যুদ্ধ-ট্রেতনা-গান্ধীর ঐতিহ্যের দেশে তো বটেই।

## নির্দলীয় গণতন্ত্র

নিকট-কালের মধ্যে গান্ধীর আদর্শের খুব কাছাকাছি গিয়ে পৌঁছেছিলেন জয়প্রকাশ নারায়ণ। ইন্দিরা গান্ধীর স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে তাঁর ছাত্র সমর্থ সার্বিতর সংগঠন অহিংস অসহযোগের এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। জীবনের সায়াহ্নে এসে ইন্দিরাতন্ত্রী ভারতের দুঃশাসনের বিরুদ্ধে তিনি যে আপসহীন সংগ্রামী ভূমিকা পালন করে গেলেন তার মহত্ব ইতিহাসে স্থান পাবে। জরুরী অবস্থা চলতে থাকা কালে তিনি যখন ইন্দিরা স্বৈরাচারের বন্দি হয়ে কারাগারের অন্তরালে দিনযাপন করছিলেন সে সময় অখণ্ডবের অবকাশে 'সার্বিক বিপ্লব' নামে অহিংস সত্যাগ্রহের এক নতুন পথের দুঃসাহসিক প্রবর্তন করেছিলেন। নির্দলীয় গণতন্ত্র এই নতুন পথের ভিত্তি স্বরূপ। গান্ধীবাদ ও অন্য প্রকরণবাদের প্রতি অযৌক্তিক বিদ্বেষিতা ত্যাগ করে আমাদের বামপন্থী বন্ধুরা যদি এই পথের কার্যকারিতা ও সম্ভাব্যতা আন্তরিকভাবে অনুসন্ধান করে দেখেন তবে একটা কাজের মত কাজ হবে বলে মনে হয়। আর যাই হোক, রক্তাক্ত বিপ্লব ছাড়া সমাজের প্রচলিত কাঠামোর মৌলিক রূপান্তর সাধন করা যাবেইনা—এমনতর নিষ্ক্রিয়-বাদের মোহ আমাদের ত্যাগ করা উচিত। আমাদের সামনে যখন একটা নয়া পথ এসে হাজির হয়েছে, তখন তাকে একটা "অনেস্ট ট্রায়াল" দিয়ে দেখতে ক্ষতি কী?

মনে হয় এককালীন কম্যুনিস্ট মনস্বী তাত্ত্বিক মানবেন্দ্রনাথ রায় দেশ বিদেশের বিচিত্র ঘটনা সংঘাতের অভিজ্ঞতার আগুনে দগ্ধিত হয়ে জীবনের শেষ পর্যায়ে অনেকটা 'নির্দলীয় গণতন্ত্রের' অনুরূপ মত ও পথের কিনারায় এসে পৌঁছে-ছিলেন। তাঁর "নয়া মানবতাবাদ"-এর ভেতর মধ্যে গান্ধী কথিত সার্বিক বিপ্লবের মূল্যবোধগুলির পরোক্ষ দ্যোতনা আছে। অন্ততঃ নির্দলীয় গণতন্ত্রের পোষকতায় এই দুই সত্তা-নিষ্ঠ ভাবুক চিন্তার সমভূমিতে দাঁড়িয়ে আছেন। ভারতের আগামী দিনের সমাজ ব্যবস্থায় নির্দলীয় গণ-তন্ত্রের আদর্শকে কাজে রূপ দেওয়া যায় কিনা সেটা পরীক্ষা করে দেখতে জনসাধারণের কল্যাণকামী ব্যক্তি মাত্রকেই আন্তরিক আহ্বান জানাচ্ছি।

# ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের গতিপ্রকৃতি

তিমির বসু

ট্রেডইউনিয়ন আন্দোলন বর্তমানে দ্বিতাবস্থার বন্দী। দ্বিতাবস্থার শিকার রাজনৈতিক দলগুলোও। কিন্তু বাম ও দক্ষিণমার্গী উভয় শিবিরেই কর্মকাণ্ডের ঘনঘটা, যদিও বাস্তবে কার্য সম্পাদন কিছু হচ্ছে না বললেই চলে, রাজনীতি বিবর্জিত ট্রেডইউনিয়ন আজকের দিনে একেবারেই অকল্পনীয়। সমস্ত কেন্দ্রীয় ট্রেডইউনিয়ন সংস্থাই কোন না কোন রাজনৈতিক দলের প্রভাবাধীন : যারা প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত নয় তারা অপ্রত্যক্ষ সম্পর্ক রেখে চলে। অবশ্য শুরুতে অবস্থাটা এরকম ছিল না ; দলীয় নিয়ন্ত্রণের বাইরে ইউনিয়ন যে একেবারেই নেই তা নয়। আছে, সংখ্যাও এদের নেহাৎ কম নয়। বিচ্ছিন্ন থাকার জন্যে এদের শক্তির বহিঃপ্রকাশ তেমন নেই কিন্তু এর অর্থ এই নয় এরা রাজনীতির ঊর্ধ্বে। আসলে 'রাজনীতি করো না' বলাও এক ধরণের রাজনীতি। কেন্দ্রীয় সংস্থান হিসেবে ন্যাশনাল ফেডারেশন অব ইণ্ডিয়ান ট্রেডইউনিয়নস, সংক্ষেপে এন এফ আই টি ইউ কোন উল্লেখযোগ্য শক্তি নয়। পশ্চিমবঙ্গের বাইরে এদের শক্তি সীমিত বলাটাও এদেরকে কিছুমাত্রায় বেশী গুরুত্ব দেওয়া। কিন্তু এরাই হচ্ছে রাজনীতিহীন ট্রেডইউনিয়নের একনিষ্ঠ প্রবক্তা। এই বিচিত্র এবং নিশ্চুকদের মতে বেলাজয়ালের কোন এক কর্মীর ইউনিয়নের সংগে 'সংশ্লিষ্টভাবে' সম্পর্কিত শ্রমিক সংগঠন অনেকটা ঘৃণীয় উদাসনা নিয়ে শ্রমিকদের কেবলমাত্র ট্রেডইউনিয়নের জন্যে ট্রেডইউনিয়ন করতে শেখাচ্ছে। কলকাতার একদা ম্যানেজমেন্ট মালিক হবার পর এরা শ্রমিকদের, বিশেষ করে শ্রমিক ইউনিয়ন সংগঠকদের মধ্যে অ-শ্রমিক রাজনীতি ফেরি করতে ব্যস্ত। প্রসঙ্গতঃ কিছু বিক্ষুব্ধ সি পি এম নেতা এদের 'অরাজনৈতিক কর্মশালার' উৎসাহী বক্তা। সাইনবোর্ডটা বাই থাক শ্রমিকদের রাজনৈতিকভাবে নির্বীজ করাই মূল উদ্দেশ্য। এদের প্রশ্ন করতে হয় : রাজনীতি কারা করবে? শ্রমিক রাজনীতি করবে না, কৃষক বছরে একবার ধর্মঘটের মিছিল করতে পারে, ছাত্ররা রাজনীতির সীমানায় ঘেঁষতে পারবে না। তাহলে? বোধহয় চরণ সিং কিম্বা প্রফুল্ল সেনের মত অশীতিপর বৃদ্ধদেরই রাজনীতি করবার একমাত্র অধিকার আছে! এন এফ আই টি ইউ জাতীয় সংগঠন শ্রমিক আন্দোলনে বিভেদ ও বিচ্ছিন্নতার প্রতিমূর্তি, কিন্তু পরিবর্তে পশ্চিমী প্রতিক্রিয়ার ভারতীয় সংস্করণের। বলার ব্যাপার, বিশ্বের ট্রেডইউনিয়নের প্রচারকদের ভাণ্ডা ভোঁতা জাতীয় একটা কিছু।

কিন্তু দলীয় নিয়ন্ত্রণাধীন ট্রেডইউনিয়ন সংগঠনও নতুন কোন অবস্থার সৃষ্টি করতে পারেনি। বামপন্থী ও দক্ষিণপন্থী, উভয় ধরণের মোর্চা পর্যায়ক্রমে একই যুদ্ধে যুদ্ধপাক খাচ্ছে। ক্ষমতায় আসবার পর বামপন্থীরা ক্ষমতা হারাবার দুশ্চিন্তায় শ্রমিক আন্দোলনের বিরোধিতা করতেই ব্যস্ত। সি পি এম এর সিটু, সি পি আই-এর এ আই টি ইউ সি, আর এস পি-র ইউ টি ইউ সি এবং ফরওয়ার্ড ব্লকের টি ইউ সি সি আন্দোলন না করে আন্দোলনকারীর ভাবমূর্তি বজায় রাখার কসরৎ করে যাচ্ছে। মালিকরা নিয়মিত আইন ভাঙছে, চুক্তি করে চুক্তি লঙ্ঘন করছে। সরকারী সুপারিশ এবং বিধি নিষেধ তোয়াক্কা না করেই এসব করছে, কিন্তু এর বিরুদ্ধে এরা এমন কিছু নিয়মিত প্রতিবাদ করছে যার ফলে আন্দোলন বিকাশের যাবতীয় সম্ভাবনাই নষ্ট হয়ে যেতে বসেছে। বামফ্রন্ট জমানায় ধর্মঘট হয়েছে সব থেকে কম, এক হিসেবে সর্বভারতীয় রেকর্ড। অন্যদিকে লক্‌আউট জনিত শ্রমদিবস নষ্টের সংখ্যা সবকাইতে বেশী। ঘেরাওয়ের সংখ্যা বাড়ছে। সোজাপথে এবং

ঘরপথে ছাটাই হয়েছে নিয়মিত এবং এখনও হচ্ছে। তুলনায় কংগ্রেস (ই) শাসিত এবং গান্ধী গণতন্ত্রের ন্যাক্কারজনক সোকেস মহারাষ্ট্রে ধর্মঘটের জন্য শ্রমদিবস নষ্টের সংখ্যা বেশী। ঐতিহাসিক সুতোকল ধর্মঘট ব্যর্থ, হওয়ার কারণ যাই হোক না কেন, দত্তা সামন্তের 'মোদুল্যেশন-তার' ব্যাখ্যা নিষ্প্রাই আছে কিন্তু বোম্বের শ্রমিকরা হাজার অসুবিধা সত্ত্বেও যে হিম্মৎ দেখিয়েছে, প্রায় উপোস করে দিনের পর দিন ধর্মঘট চালিয়েছে এবং পুলিশী নির্যাতন উপেক্ষা করেও উৎপাদন বন্ধ রেখেছে ইদানীংকালে তার তুলনা মেলা ভার। বোম্বের শ্রমিক আন্দোলনের ইতিহাসে এই বৃহত্তম এবং দীর্ঘতম ধর্মঘট নিজেই এক ইতিহাস। আর মারাঙ্কটের রাজত্বে এবং বামপন্থীদের ও কংগ্রেস (ই)-র যৌথ নেতৃত্বে কেবলমাত্র দুটো বড় ধর্মঘট হয়েছে—দুটোই চটকলে। ১৯৭৯-র ধর্মঘট আর তারপর ধর্মঘট এই চুরাশিতে। ধর্মঘট মিটে যাবার পর ঘটা করে বিজয় উৎসব হয়েছে। কিন্তু মাস পেরোতে না পেরোতেই দেখা গেল মালিকরা চুক্তি মানছে না। আর ১৯৮৬-তে ধর্মঘট হয়েছে প্রধানতঃ ১৯৭৯ সালের চুক্তি না মানার জন্যে। ১৯৭৭ সালে যে ধর্মঘট হওয়া উচিত ছিল সি পি এম তাকে ঠেলে নিয়ে যায় ১৯৭৯ সালে, আর ১৯৮০ সালে যে ধর্মঘট হবার কথা অনেক কষ্টে সিটু ১৯৮৪-তে তার সম্মতি দেয়। '৮৪ সালে ধর্মঘট ৮৪ দিন। এর আগের রেকর্ড ১৯৭৯ সালে ৩০ দিন। ইতিহাসের এমনই নির্মম পরিহাস চট শিল্পে সি পি এম অর্থাৎ সিটু এবং তার সহযোগীদের ধর্মঘট নামানোর জন্যে কংগ্রেস (ই) এবং এস, ইউ, সি, একসময় আন্দোলনের কথা ভাবছিল। এ, আই, টি, ইউ, সি অনেক আগেই ধর্মঘটের স্বপক্ষে অভিমত দিলেও সিটুর সঙ্গে আঁতাত ভেঙে যাওয়ার ভয়ে সরাসরি কিছু বলতে পারেনি। এদের হয়েছে অনেকটা সাপের ছুঁচো গেলার অবস্থা।

আসল ব্যাপারটা হচ্ছে চটকল ধর্মঘট এমনভাবে সংগঠিত করা হয়েছে এবং সময়টা এমন প্রসঙ্গক্রমে বেছে নেওয়া হয়েছে যার ফলে চটকল মালিকদের শেষ পর্যন্ত খুব একটা অসুবিধায় পড়তে হয়নি। ইন্দিরা কংগ্রেসীরা কলকাতায় প্লেনাম করবে, অতএব আই, এন, টি, ইউ সি নেতাদের সুবিধার জন্য ধর্মঘট একমাস পিছিয়ে দেওয়া হল। কংগ্রেস (ই)-র প্লেনাম নাহলে '৮০-র ডিসেম্বরেই ধর্মঘট হবার কথা ছিল ও নীরেন ঘোষ একবার মুখ ফসকে বলে ফেলেছিলেন নভেম্বরে ধর্মঘট হবে। আবার যখন মালিকরা বেকায়দায় পড়ছে তখনই তড়িঘড়ি করে ধর্মঘট তুলে নেওয়া হল। ঘটনা হচ্ছে চটকল শিল্পবিরোধ প্রশ্নে একটা পর্যায়ে কংগ্রেস (ই) বেশ কিছুটা রক্ষণশীলতা দেখিয়েছিল। চটশিল্প জাতীয়করণ জিগিরের স্বপক্ষে তারাই ছিল সব চাইতে সোচ্চার। আবার ধর্মঘট থেকে সরে আসার ব্যাপারে কংগ্রেস (ই) মার্কসবাদীদের প্রধান সহযোগী। ৮৪ দিন ধর্মঘটের পর মালিকদের শর্তেই মীমাংসা হল, দাবী বা আদায় হল তার জন্য ধর্মঘট না করলেও চলত। অর্জিত অধিকার রক্ষার ব্যাপারে বামপন্থীরা এককালে যথেষ্ট সোচ্চারগোল তুলেছিল আর ধর্মঘট করে কীভাবে অর্জিত অধিকার ছেড়ে দিতে হয় তার নজীরবিহীন নজীর হয়ে থাকবে '৮৪ সালের চটকল ধর্মঘট। এর আগে '৭৯ সালের ধর্মঘটের সুবাদে ওয়াকলোড কমিটি তৈরী হয়। এই কমিটি শ্রমিকদের স্বার্থে যে রায় দিয়েছিল '৮৪ তে নতুন টেকনিক্যাল কমিটি স্বীকার করে নিয়ে আবার '৭৯ সালের ধর্মঘটের আগের অবস্থায় ফিরে আসা হল। অথচ একেই বলা হচ্ছে বিশাল জয়। জয় কিছু হয়েছে ঠিকই—মালিকরা ক্যান্টিনে সস্তায় চা সিঙ্গাড়া খাওয়াবার প্রশ্নে যথেষ্ট উদারতা দেখিয়েছে। চটকল শ্রমিকরা বোধহয় ক্যান্টিনের জন্যই ধর্মঘট করেছিল! ধর্মঘট আরও মাস দুয়েক চললে মালিকদের নাভিশ্বাস উঠত। এমনকি আর দু'সপ্তাহ চালাতে পারলেও যথেষ্ট সম্মানজনক শর্তে মীমাংসা হতে পারত কারণ বাজারে জোর 'গুজব' ছিল রাশিয়ান আর জাপানী অর্ডার নাকি প্রায় হাতছাড়া হতে বসেছে। গুজবের পশ্চাৎপট এই রকম : রাশিয়ান আর জাপানী প্রতিনিধিরা রাজ্য সরকারের নিয়ন্ত্রণ-হীন গ্রেট ইস্টার্ন হোটেল থেকে দফায় দফায় খবর নিচ্ছিল মীমাংসা কতদূর এগোলো। এ, আই, টি, ইউ সি নেতাদের বেসরকারী অভিমত, ধর্মঘট আর দু' সপ্তাহ খুব সহজেই চালানো যেত। এমনকি চটকল মালিকরা কিছুদিন আগে ইণ্ডিয়ানাইরিং শিল্পে স্বাক্ষরিত ত্রিপাক্ষিক চুক্তি অনুযায়ী ডি এ দিতে অস্বীকার করে, তবুও এই 'জয়' নাকি ঐতিহাসিক।

# তৃতীয় রেল

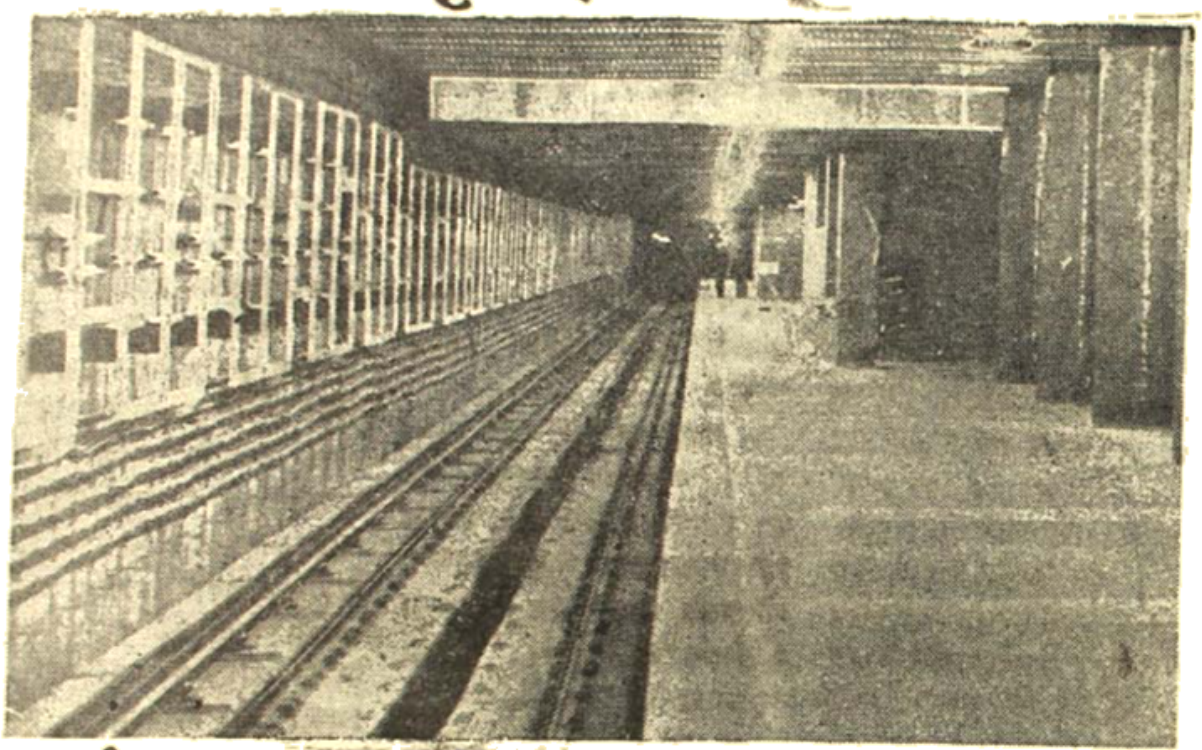

ইস্পাতে তৈরী দুটো লাইন পাশাপাশি চলতে চলতে, অনেক দূরে গিয়ে যেন মিলেমিশে একাকার হয়ে গিয়েছে—রেলওয়ে বলতে এই ছবিটিই আমাদের মনে ভেসে ওঠে।

মেট্রো রেলের ছবিটি কিন্তু অন্যধরণের। এখানে দুটো লাইনের সঙ্গে সঙ্গে ছুটছে আরও একটি লাইন। বিদ্যুৎবাহী তৃতীয় রেল।

মেট্রোরেল চলবে বিদ্যুতে। তৃতীয় রেলই ট্রেনে বিদ্যুৎ যোগাবে। এরজন্য এই রেলটি তৈরী হচ্ছে এক বিশেষ ধরণের ইস্পাতে। কংক্রীটস্তরের ওপর বসানো চীনেমাটির ইনস্যুলেটরের ওপরে থাকবে এই তৃতীয় রেল।

মেট্রো রেল
কলিকাতা
(ভারত সরকারের একটি প্রকল্প)

বোম্বের সুতোকল ধর্মঘট দীর্ঘস্থায়ী হওয়া সত্ত্বেও বাজারে বিশেষ কোন প্রতিক্রিয়া হয়নি কারণ পাওয়ারলুমে চাহিদা মিটিয়েছে। কিন্তু চটশিল্পে বিকল্প কোন উৎপাদন ব্যবস্থা চালু করা সম্ভব নয়। পশ্চিমবঙ্গের বাইরে যেসব মিল রয়েছে, বিশেষ করে অন্ধ্রপ্রদেশ, তারা বড়জোর মোট চাহিদার শতকরা দশভাগ মেটাতে পারে। চটশিল্পে এখনও রয়েছে বাণিজ্য মালিকদের সরাসরি নিয়ন্ত্রণ আন্ডার ইনভয়েসিং তথা বিদেশী ব্যাঙ্কে বৈদেশিক মুদ্রা পাচার চট শিল্পে আর পাঁচটা জিনিষের মতই স্বাভাবিক ঘটনা। বেশীদিন এই রপ্তানি বন্ধ থাকলে অনেক মালিকের পক্ষে পাগল হয়ে যাওয়া বিচিত্র নয়। আবার কালো টাকা তৈরীর অন্যতম প্রধান উৎস হচ্ছে কাঁচা পাট। প্রতিদিন প্রতিঘন্টায় এখানে নাকাওয়ালারা কালো টাকার জন্ম দেয় ফেক গ্রেডের বেরফের ঘটিয়ে। ধর্মঘট তাড়াতাড়ি মিটিয়ে ফেলবার ব্যাপারে মালিকদের যথেষ্ট তাড়া ছিল—আর জ্যোতিবাবু শ্রমিক প্রতিনিধিদের সংগে পর্যাপ্ত আলোচনা ছাড়াই যেভাবে একতরফা ফয়সালা চাপিয়ে দিলেন তার জন্যে মালিকদের ট্রেড ইউনিয়ন—আই জে, এম, এ শ্রমিক 'বিরোধী' মার্কসবাদী মুখ্যমন্ত্রীকে বহুদিন সাধুবাদ জানাবে। ধর্মঘট শুরু হবার আগে এক গুজরাটী মালিকের একজন উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা বর্তমান প্রতিবেদকের সংগে একান্ত সাক্ষাৎকারে এমন একটা ভাব দেখাচ্ছিলেন যে অনন্তকালধরে ধর্মঘট হলেও তারা বেপরোয়া। অন্ত ধর্মঘট এক মাস না পেরোতেই এই ভদ্রলোকই আবার একদিন বললেন—সত্যিই অসুবিধা হচ্ছে। শ্রমিকদেরও বেশী অসুবিধা হচ্ছে, অতএব ব্যাপারটা তাড়াতাড়ি মিটে যাওয়া ভাল।

পশ্চিমবঙ্গ ভারত নয়, আর পশ্চিমবঙ্গ গণআন্দোলনের কর্মক্ষেত্র বলে বামপন্থীরা যে দাবী করে তার আদৌ কোন ভিত্তি নেই। নেহেরুর দেওয়া মিছিলের শহর কলকাতা—এই অপবাদও ঘুচে গেছে। এর জন্য ধন্যবাদটা বামপন্থীদেরই প্রাপ্য। দিল্লীর বোটক্লাবে এখন অনেক বেশী জমায়েত হয়। সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে ট্রেডইউনিয়ন জগতে এখনও পর্যন্ত দক্ষিণপন্থীদেরই প্রাধান্য। কেন্দ্রীয় শ্রম কমিশনারের সর্বশেষ হিসেব অনুযায়ী ইন্দিরা গান্ধীর আই, এন, টি, ইউ, সি সবার উপরে—সদস্যের বিচারে। এরপর হিন্দু সাম্রাজ্যের স্বপ্নবিলাসী বিজেপি নিয়ন্ত্রিত বিএম এস, বহুধা বিভক্ত সমাজতন্ত্রীদের এইচ, এম, এস, অবশ্য এখনও তৃতীয় কিন্তু এই অবস্থাটা কতদিন থাকবে বলা যায় না। কারণ জর্জ ফার্নান্ডেজ বেরিয়ে যেয়ে নিজস্ব কেন্দ্রীয় ইউনিয়ন তৈরী করেছেন। কম্যুনিস্টরা বয়সের দিক থেকে হাফ-সেঞ্চুরী পেরিয়ে এসেছে বহুদিন, তাদের ট্রেডইউনিয়ন ফ্রন্ট কাজকর্ম দীর্ঘদিনের কিন্তু সিটু, এ আই টি ইউ সি এখনও পর্যন্ত সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে তেমন কোন শক্তি নয়। যে পদ্ধতিতে এরা কাজ করে তার ফলে অদূরভবিষ্যতে এদের কোন ভবিষ্যৎ আছে বলে মনে হয় না। রাজনৈতিক দিক থেকে এরা অনেকটা ব্রিটিশ লেবর পার্টির কাছাকাছি কিন্তু লেবর পার্টির ট্রেড ইউনিয়ন করবার ক্ষমতাও এদের নেই। ব্রিটিশ কয়লাখনি শ্রমিকদের সাম্প্রতিক লম্বা লড়াই থ্যাচারের মত বুলেটপ্রুফ মহিলাকেও রীতিমত ভাবিয়ে তুলেছে। কিন্তু সাতবছরে সিটু সবসময় চেষ্টা করে এসেছে কীভাবে ব্যক্তিগত মালিকানাধীন সংস্থায় ধর্মঘট এড়ানো যায়। কলোরিয়ানের আশীর্বাদধন্য হবার জন্য এরা ধর্মঘট ভাঙতেও কসুর করেনি, বহু জায়গাতে মার্কসবাদীদের বাদ দিয়ে দরিদ্র শ্রমিকরা কংগ্রেস (ই)-কেই ত্রাতা হিসেবে ভাবতে পেরেছে, বামফ্রন্ট রাজত্বেই এটা ঘটেছে, এর তো একটা বাস্তব ভিত্তি রয়েছে। রাতারাতি ভোজবাজির মত এই পরিবর্তন সম্ভব নয়। সিটু শুরু থেকেই চেষ্টা করে আসছিল কীভাবে কিন্তু চলনসই আন্দোলন কেবলমাত্র কেন্দ্রীয় সরকারের নিয়ন্ত্রণাধীন সংস্থায় ঠেলে দেওয়া যায়। এটা আবার এ আই টি ইউ সি'র পছন্দ নয়। কিন্তু ডক ও বন্দরে যে ধর্মঘট হয়েছে সেখানে এদের ভূমিকা নিতান্তই নগন্য। কয়লা শিল্পে অবশ্য ধর্মঘটে আই এন টি ইউ সি'র বিরোধিতা করেই ধর্মঘট হয়েছে কিন্তু কর্তৃপক্ষ যেভাবে একের পর এক অধিকার কেড়ে নিচ্ছে সে তুলনায় প্রতিবাদ খুব সামান্যই। কোল ইণ্ডিয়ার বর্তমান কর্ণধার এম. এস. গুজরাল প্রতিক্রিয়ার জীবন্ত নিদর্শন। অধ্যাদেশের নিয়মকানুন প্রবর্তন করে কথায় কথায় শ্রমিকদের বেতন কাটার ব্যবস্থা হয়েছে কিন্তু এর বিরুদ্ধে সিটু অথবা এ আই টি ইউ সি কোন

স্থায়ী প্রতিরোধ গড়ে তুলতে পারেনি। খোঁজ নিলে দেখা যাবে বাটিল কয়লাখনি শ্রমিকদের লড়াইয়ের খবর এখনও রাণীগঞ্জ, আসানসোল ঝরিয়া কিম্বা ধানবাদে এসে পৌঁছায়নি। পাবলিক সেকটরে কিছু আন্দোলন করলে কেন্দ্রীয় সরকারকে বিব্রত করা যায়, স্রেফ এই দৃষ্টিভঙ্গী থেকে এরা পরিচালিত হচ্ছে। ফলে আন্দোলন অপেক্ষা আন্দোলন করা হবে জাতীয় প্রচারই বেশী হয়।

লকআউটে পশ্চিমবঙ্গ সরকার পাশে। কংগ্রেস জামানাতেও পাশে, বামফ্রন্ট আমলেও সেই ট্রাডিশান সমানে চলেছে। লক-আউট হচ্ছে মালিকের ধর্মঘট, এর বিরুদ্ধে প্রচলিত প্রভাইনের আওতায় কিছু সরকারী ব্যবস্থাও গ্রহণ করা যায়, আন্দোলনের পথ না হয় ছেড়েই দেওয়া গেল, ধরে নেওয়া গেল সামগ্রিকভাবে আন্দোলন 'মার্কসবাদী পথ'-এ ট্যাকিকস্যাসে আটকে গেছে কিন্তু সরকার প্রশাসন যন্ত্র দলীয় ইউনিয়নের স্বার্থসিদ্ধির কাজে ব্যবহার করছে, আইনভঙ্গকারী মালিকদের বিরুদ্ধে নয়। সরকারী অফিস, কোঅর্ডিনেশন কমিটির অফিস কার্যতঃ সি পি. এমের অফিস। সরকারী আমলারা শাসকদলের হয়ে যেভাবে কাজ করছে তার কোন নজীর কংগ্রেসীরা রেখে যেতে পারেনি। আশা করা যায় এরপর থেকে তারা 'মহাজন' নির্দেশিত পথেই চলবে। বিরোধী দলের ইউনিয়নের আর নকশালপন্থীদের ইউনিয়ন হলে তো কথাই নেই—ধর্মঘট ভাঙার ব্যাপারে জ্যোতিবাবুরা ইতিমধ্যে বিধান রায়-প্রফুল্ল সেনদের রেকর্ড ম্লান করে দিয়েছেন। ট্রেড-ইউনিয়ন ফ্রন্টে কংগ্রেস-ই 'মহানদের' পাশট অকংগ্রেসী জমানাতেও কিছুমাত্র কমেনি। এমনকি কংগ্রেস-ই সম্পর্কিত ধর্মঘট হলে জ্যোতিবাবুরা একটু সমঝে চলেন। তবু, পাছে প্রগতিশীল বৈদেশিক নীতির বাহিকা ইন্দিরা গান্ধী রাগ করেন। বামপন্থী নপুংসকদের বীরত্বটা কেবলমাত্র নকশালপন্থীদের ক্ষেত্রেই। তবে বামফ্রন্টের ছোট শরিকরাও রেহাই পাচ্ছে না।

শ্রমিক আন্দোলনে রাজনীতি একটা আছে বটে—সুবিধাবাদের রাজনীতি। বিগত এক দশকে সংগঠিত শ্রমিকদের সাধারণ প্রবণতা হচ্ছে যখন যে ক্ষমতায় থাকে তার স্বপক্ষে ঝান্ডা বদল করা। ফ্রন্ট শাসনের প্রথম পাঁচ বছরে এই প্রবণতা বামফ্রন্টের বিশেষ করে সি পি এম-এর অনুকূলে ছিল। ফলে বামপন্থীদের এমন একটা ধারণা হয়েছিল বিনা যুদ্ধেই জমিদারি বৃদ্ধি সম্ভব। জমিদারের ধানসিকতা থেকেই এদেশে ট্রেড ইউনিয়ন পরিচালিত হয় আর ইউরোপে পুঁজিপতির। পট পরিবর্তনের সাথে সাথে রাতারাতি এন এল সি সি ইউনিয়ন সিটু ইউনিয়ন হয়ে গেছে। ইন্ডিয়া ফরেলস্-এর এন এল সি সি ইউনিয়ন সাধারণ সভা করে সিটুর হাতে কাগজপত্র তুলে দিয়েছিল বিনা বাক্যব্যয়ে, রক্তপাতের কোন ব্যাপারই নেই। কিন্তু ইদানীং এর ব্যতিক্রমও দেখা যাচ্ছে। বিভিন্ন জায়গায় সিটু ইউনিয়ন দ্রুত ভেঙে যাচ্ছে, যত দ্রুতগতিতে জন্ম নিয়েছিল ঠিক তত দ্রুততার সঙ্গেই নিশ্চিহ্ন হয়েছে, আবার দু'টুকরো হয়ে দাবী করছে তারাই আসল সিটু। এমনকি সরকারী মালিকানাধীন বসুমতীতেও দুটো সিটু ইউনিয়ন। একসময় দুটো সিটু ইউনিয়ন ছিল রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদেও। পরে একটা নকশালদের নেতৃত্বে চলে যায়। মেডিক্যাল রিপ্রেসেনটিটিভদের অভাবনীয় ঐক্যবদ্ধতা ভাঙতে পারেন নি। মার্কসবাদের এই প্রহসনে কংগ্রেসীরা মজা দেখছে সন্দেহাতীতভাবে। তবে কংগ্রেসীদের মধ্যেও এই জাতীয় ঘটনার বাহুল্য দেখা যাচ্ছে আজকাল। রাজ্য বিদ্যুৎপর্ষদে দুটো আই, এন. টি. ইউ. সি ইউনিয়ন পরস্পরের গলা কাটতে পারলে বেঁচে যায়। ডকেও ভাগাভাগি চলছে। এ আই টি ইউ সি ইউনিয়ন বহু জায়গাতে দ্বিধাবিভক্ত হবার অপেক্ষায়। এক্ষেত্রে অবশ্য কারণটা ডাঙ্গের এ আই সি পি। ডাঙ্গেওয়ালারা ই-কংগ্রেসীদের সঙ্গে আঁতাত করতে অতিমাত্রায় উৎসাহী, ফলে এ আই টি ইউ সি'র অভ্যন্তরেও দ্বন্দ্ব বাড়ছে। এই সমস্ত ঘটনা নিশ্চিতভাবে প্রমাণ করছে আসলে কেন্দ্রীয় ট্রেডইউনিয়নের ধারণা ঠিক ততটা কেন্দ্রায়িত নয়।

বর্তমান কেন্দ্রীয় ও আঞ্চলিক অর্থাৎ ফেডারেশন ভিত্তিক সাংগঠনিক আধার আর খুব একটা কার্যকর হচ্ছে না। এ আই টি ইউ সি এবং সিটু ব্যাপারটা যে বুঝছে না তা' নয় কিন্তু কোনপথে গেলে সুবিধা হবে সে সম্পর্কে এখনও তারা দ্বিধাগ্রস্ত। তবে এ আই টি ইউ সি ইতিমধ্যে জাতীয় স্তরে সিটুর সংগে মিলে এক কেন্দ্রীয় সংগঠন গড়ে তুলবার প্রস্তাব

নিয়েছে। অবশ্য '৭০ সালের আগে এরা সব এক কেন্দ্রীয় সংগঠনে ছিল। এ ব্যাপারে ইস্ট্রাজিৎ গুপ্তের রণদিভেকে চিঠি দিয়ে তাদের সমিক্ষার কথা জানিয়ে রেখেছেন। যদিও চিঠির বয়ানে একটু কায়দা করে সম্পূর্ণ সংযুক্তির ব্যাপারটা উহ্য রাখা হয়েছে ....if we aim at a Confederation with a higher level of class and political consciousness which is certainly desirable would it not lead to self-exclusion of some central organisations?

ইস্ট্রাজিৎ গুপ্তের এই চিঠির প্রেক্ষাপট হচ্ছে ইতিপূর্বে সিটু বাঙ্গালোরে confederation এর এক প্রস্তাব নেয়। কানপুরে রণদিভে এই প্রস্তাবেরই পুনরাবৃত্তি করেন কিন্তু রণদিভের বক্তব্য অনেকটা ধরি মাছ না ছুঁই পানি গোছের।

'Their must be a genuine attempt to bring all organisations who have a say with the workers, who are vitally interested in the unity and cohesion of the trade union movement and who do not indulge in cross-firing within the movment itself and specialise in attacing progressive and left forces.'

ইস্ট্রাজিৎ গুপ্তের অভিমত: Confederation কোন কাজের কথা নয়। এটা অনেকটা বর্তমানে বামপন্থী কেন্দ্রীয় ট্রেডইউনিয়ন সংগঠনগুলোর যে সর্বভারতীয় যোগাযোগ রয়েছে National Campain Committee (NCC) তার রকমফের। কথাটা একেবারেই মিথ্যে নয়। NCC-তে জাতীয়স্তরে এস ইউ সি নিয়ন্ত্রিত ইউ টি ইউ সি [ এল এস ]ও রয়েছে কিন্তু পশ্চিমবঙ্গে এস ইউ সি ও সি পি এম কোন অবস্থাতেই যৌথ আন্দোলনের পর্যায়ে নেই। সি পি এম বরং ৫ কংগ্রেস(ই)-র সঙ্গে ট্রেড ইউনিয়ন ফ্রন্টে যৌথ আন্দোলনের পক্ষপাতী। এস ইউ সি আবার সি পি এম-র বিরুদ্ধে সর্বাত্মক বিদ্রোহে আই এন টি ইউ সি-কে কাছে পেতে চায়। কিন্তু চটকল ধর্মঘটে আই এন টি ইউ সি যেভাবে যৌথ মোর্চা ভেঙে দিয়ে সিটুর সঙ্গে সুর মিলিয়ে ধর্মঘট তুলে নিল তারপর এস ইউ সি কংগ্রেসীদের উপর খুব একটা ভরসা করতে পারছে না।

NCC কার্যতঃ ব্যর্থ। যে কারণে NCC কার্যকর হচ্ছে না একই কারণে Confederationও বর্তমান স্থিতাবস্থা ভাঙতে পারে না। আসলে NCC-র মধ্যে সি পি এম সি পি আইকে নিয়ে একটা স্বতন্ত্র কেন্দ্র বজায় রাখতে চাইছে। এই ধরণের উপদলীয় চক্রান্ত সি পি এম-এর পক্ষে খুবই স্বাভাবিক। এর দ্বারা এক ধরণের ঘনেবন্ধি হয় কিন্তু ট্রেড-ইউনিয়ন আন্দোলনের ব্যাপ্তি ও বিস্তার সম্ভব নয়।

একদিকে যখন Confederation এক কেন্দ্রীয় সংগঠন ইত্যাদি নিয়ে কেন্দ্রীয় নেতৃ পর্যায়ে কথাবার্তা চলছে তখন নীচুর তলায়, বিশেষ করে পশ্চিমবঙ্গে বামপন্থীদের মধ্যে আন্ত ট্রেডইউনিয়ন সংঘর্ষ চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছেছে। ইউনিয়ন দখল ও বাড়াবার জন্যে খুনোখুনিকে প্রশ্রয় দেওয়া হচ্ছে। ইন্ডিয়ান অয়েল কর্পোরেশনে এ আই টি ইউ সি নিয়ন্ত্রিত ইউনিয়ন ছিল। সিটুর বোমবাজির মোকাবিলা করতে ব্যর্থ হওয়ার নেতৃত্ব আই এন টি ইউ সি'র হাতে ইউনিয়ন তুলে দেয়। 'মাও'সবাদী' মস্তানদের এখন আর খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। রাণীগঞ্জ আসানসোল এলাকার কয়লাখনি শ্রমিকদের মধ্যে এ আই টি ইউ সি'র নিয়ন্ত্রণ প্রভাব দীর্ঘদিনের। সি পি এম-র হারাধন রায় হাজার চেষ্টা করেও সি পি আই-র কল্যাণ রায়ের প্রভাব ভাঙতে পারেনি। প্রায় বছর দুয়েক আগে স্থানীয় এ আই টি ইউ সি নেতা অনেক সিককে নৃশংসভাবে খুন করায় ঐ এলাকায় দারুণ উত্তেজনা ছড়িয়েছিল। শোনা যায় এ আই টি ইউ সির পাল্টা 'টেকনিকাল' ব্যবস্থা জোরদার করার জন্যে মজুরেরা স্বতস্ফূর্তভাবে চাঁদা দিয়েছিল। একটা পরিত্যক্ত পাতকুয়ো থেকে সিং-এর কাটামুণ্ড উদ্ধার করতে এ আই টি ইউ সি কর্মীদের যথেষ্ট বেগ পেতে হয়েছিল। কেশোরাম কটন শ্রমিকদের এ আই টি ইউ সি নেতা অরুণ সেন। দীর্ঘ ৩০ বছরেরও বেশী সময় ধরে শ্রীসেন মেটিয়াবুরুজ অঞ্চলে পরিচিত ট্রেড-ইউনিয়ন নেতা। কংগ্রেসীরা এই অরুণ সেনকে ঘর থেকে টেনে পেটালো কিন্তু সিটু 'ঘদু' প্রতিবাদ ভিন্ন কিছুই করে নি। কারণ কেশোরামে-এ আই টি ইউ সি ইউনিয়ন ভেঙে দেওয়া সিটুরও লক্ষ্য।

বামপন্থী ট্রেডইউনিয়ন আন্দোলন এমনিতেই দিশেহারা, দুর্বল তো বটেই। পারস্পরিক হানাহানির জন্যে

শুধু জনগণের এর অন্তিম ঘণ্টা বাজছে। 'অতি' বাদ দিলে যারা পরিচিত সাধারণভাবে ট্রেড ইউনিয়নে তাদের পরিচিতি যৎসামান্যই। সর্বাত্মক ধর্মঘট বা অন্য কোন কার্যক্রম দ্বারা জাতীয় বা রাজ্যস্তরে এরা এদের শক্তি জাহির করবার মত অবস্থায় নেই। অবশ্য দু' একটি ইউনিয়ন রাজ্য সরকারকে ঘোল খাওয়াতে সক্ষম কিন্তু এর দ্বারা নিকট ভবিষ্যতে কোন বিকল্প ট্রেডইউনিয়ন আন্দোলন বিকশিত হবার সম্ভাবনা ক্ষীণ। আই এন টি ইউ সি কিম্বা সিটু অনুসৃত পদ্ধতিতেই 'বিপ্লবী' ট্রেডইউনিয়ন আন্দোলন সৃষ্টি করা সম্ভব নয়। একই ধরনের ঘাবাসনদ পেশ কিম্বা চিরচরিত প্রথায় লেবার কমিশনারের দপ্তরে অন্তহীন আলাপ-আলোচনা বর্তমান পরিস্থিতিতে ট্রেডইউনিয়ন হিসাবে টিঁকে থাকতে সাহায্য করে সন্দেহ নেই কিন্তু এর সাহায্যে শ্রমিক মননে বিপরীত শক্তির ধারণা গড়ে উঠছে না। শ্রম কমিশনারের অফিসের উপর যান্ত্রিক নির্ভরতা এখন এক জটিল পরিস্থিতির জন্ম দিতে বাধ্য যার ফলে শ্রমিকরা শেষপর্যন্ত হতাশ হয়ে যায়। আইন শ্রমিকদের জন্য যথেষ্টই আছে কিন্তু তার ব্যবহারিক মূল্য খুব একটা নেই কারণ উচ্চতর আদালতে শক্তি পরীক্ষার সামর্থ্য ছোটখাটো ইউনিয়নের নেই। আজকাল ট্রাইব্যুনাল জাতীয় কোর্টে শ্রমিকরা হয়তো জেতে কিন্তু সরকার বাহাদুর এতই নিরুপায় যে শ্রমিকের অনুকূলে কোর্টের রায় কার্যকর করবার মত যথেষ্ট ক্ষমতা তার নেই। মালিকরা ইচ্ছে করলে যে কোন রাজ্যকে দশ থেকে কুড়ি বছর সহজেই আইনের জোড়াজালে আটকে রাখতে পারে। শ্রম আইন ভিত্তিক আইনের লড়াইয়ের পরিসর ক্রমশই ছোট হয়ে আসছে। অধিকাংশ শ্রম আইনের প্রেক্ষাপট দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ-কালীন অর্থনৈতিক অবস্থা, ঐসব আইন আজ বর্তমান অবস্থার সঙ্গে খাপ খাচ্ছে না। পরিবর্তন আশু প্রয়োজন। এই পরিবর্তনটা স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে শাসক কংগ্রেসীরা করবে না। আবার ট্রেডইউনিয়ন আন্দোলনের পক্ষ থেকে কোন মডেল আইনের জন্য আন্দোলন করা হচ্ছে না। আইন তৈরী হবার পর কিছু হৈ চৈ হয়। কোন ট্রেডইউনিয়ন নেতৃত্বই নেতিবাচক নীতির উর্ধ্বে উঠতে


## পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ

৬এ, রাজা সুবোধ মল্লিক স্কোয়ার, আর্য ম্যানসন,
( নবম তল ), কলিকাতা—৭০০০১৩
ফোন : ২৬-৭৮৫৪

পর্ষদ প্রকাশিত প্রতিরক্ষা বিদ্যা, সাংবাদিকতা, ভূগোল, বিজ্ঞান, আইন ও প্রযুক্তিবিদ্যা বিষয়ক কয়েকটি বই

| | | |
|---|---|---|
| হিটলারের যুদ্ধ : প্রথম খণ্ডমান | | |
| হিংসে ফিস : রণনীতি ও রণকৌশল | প্রফুল্লকুমার চক্রবর্তী | ২৪-০০ |
| প্রতিরক্ষাবিদ্যা : যুদ্ধ, সামরিক ইতিহাস, সমরাস্ত্র ( ২য় খণ্ড ) | সুবিমল দেব, প্রিয়দর্শন সেনশর্মা মনোরঞ্জন দে | ২৬-০০ |
| প্রতিরক্ষাবিদ্যা, জাতীয় নিরাপত্তা ও সামরিক ভূগোল ( ১ম খণ্ড ) | প্রিয়দর্শন সেনশর্মা | ১২-০০ |
| গণজ্ঞাপন | পার্থ চট্টোপাধ্যায় | ২৫-০০ |
| বিজ্ঞাপনবিদ্যা | অনিলকুমার রায়চৌধুরী ও প্রভাতকুমার গোস্বামী | ১১-০০ |

কলিকাতা সংস্কৃত স্কুলের নীচতলায় অবস্থিত পর্ষদের বিপণন কেন্দ্রে এবং কলেজ স্ট্রীটের পুস্তক বিক্রেতাদের কাছে পর্ষদ প্রকাশিত সমস্ত বই পাওয়া যায়। কলা ও অন্যান্য বিষয়ের বইগুলির জন্য যোগাযোগ করুন।

পারছে না। বামপন্থীরা এখন কিছুই করতে চায় না যার ফায়দা বৃটিশ এবং পরবর্তীকালে কংগ্রেসী গ্রাউডিশন বিস্তৃত হয়। পশ্চিমবঙ্গের শ্রম আদালত (ট্রাইবুনাল) সমূহের প্রাক্তন প্রধান বিচারক একবার কিছুটা চেষ্টা করেছিলেন। তার প্রস্তাব ছিল : নিম্নেনপক্ষে সাম্প্রতিক বৃটিশ আইনের মডেলে প্রচলিত শ্রম আইনে কিছু সংশোধন ও পরিমার্জন করলে শ্রমিকরা অনেক বেশী সুবিধা পেতে পারে। আইনটা কেন্দ্রীয় সরকার তৈরী করবে কিন্তু রাজ্য সরকারও তার 'সীমিত' ক্ষমতার মধ্যে এমন কিছু আইনানুগ ব্যবস্থা নিতে পারে যার ফল সুদূরে প্রসারী হতে বাধ্য। বামফ্রন্ট সরকার দ্বিতীয়বার ক্ষমতায় আসার আগেই জন্ম নিয়েছে। বিশ্লেষণ করতে নয়। তাই বিচারকের পরামর্শ শোনবার মত সময় তাদের নেই। আশ্চর্যের ব্যাপার হঠাৎ এক সকালে জানা গেল এই বিচারককে এমন এক জায়গায় বদলি করে দেওয়া হয়েছে যেখানে শ্রমসংক্রান্ত কোন মামলা করবার সুযোগ নেই। নিট সেক্রেটারিয়েটে কিছু কালো কোট গায়ে দেওয়া নিম্নকর্মী অবশ্য বলাবলি করে—ভদ্রলোকের একমাত্র অপরাধ তার এজলাস থেকে সব সময় শ্রমিকপক্ষ জয়লাভ করত, মালিকরা হাজার হাজার টাকা উকিলের পেছনে ঢেলেও সুবিধা করতে পারত না। সুতরাং নিরপেক্ষ গণতন্ত্র রক্ষার স্বার্থে বদলি অবশ্যম্ভাবী। শ্রমিকদরদী বামফ্রন্ট জমানাতেই মালিকরা এ ধরনের গণতন্ত্র প্রত্যাশা করতে পারে বৈকি।

অর্থনৈতিক সংকট বাড়ছে বলেই বহুক্ষেত্রে বামপন্থীরা, দক্ষিণপন্থীদের কথা না বলাই ভাল, কোন ট্রেডইউনিয়ন আন্দোলনের ঝুঁকি নিতে চাইছে না বলে অনেকের ধারণা। আর সরকারকে বিব্রত করবার সমস্যা ত 'ডেথ্ অফ্ কোর্সের ভয়ঙ্কারি' হয়ে দাঁড়াচ্ছে। কিন্তু সংকট আছে বলেই আন্দোলনের প্রয়োজন। সাধ করে কেউ ধর্মঘট করে না। প্রকৃত মজুরি ক্রমাগত কমছে বলেই প্রতিরোধ অনস্বীকার্য। মেশিনের অস্বাভাবিক গতি বাড়িয়ে, কাজের বোঝা বৃদ্ধি করে, র‍্যাশনালাইজেশনের নামে পেছনের দরজা দিয়ে অটোমেশন চালু করে সংগঠিত শ্রমিকদের সংখ্যা ক্রমান্বয়ে কমিয়ে আনা হচ্ছে। সুতরাং আন্দোলনের বাস্তব অবস্থা রয়েছে। এই অবস্থা থাকা সত্ত্বেও নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধের মনোভাবই প্রাধান্য পাচ্ছে।

প্রশ্ন হচ্ছে ট্রেডইউনিয়ন আন্দোলনে নতুন দৃষ্টিভঙ্গী ভিন্ন বর্তমান দ্বিতীয়বস্থা ভাঙা সম্ভব নয়। যারা দ্বিতীয়বস্থার বন্দী তারাও ক্ষেত্রবিশেষে নিজেদের অক্ষমতা সম্পর্কে অল্পবিস্তর সোচ্চার। এইচ, এম, এস-এর পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির সভাপতির বাসনা, নতুন ধারণার ট্রেডইউনিয়ন তৈরী করতে না পারলে এই ঘোড়-বড়ি খাড়া খাড়াবড়ি ঘোড় করে ঘুরে একটা লাভ নেই। কলকাতা ডকের অনেক সিটু নেতা—ইনি সম্প্রতি চীন ঘুরে এসেছেন—ব্যক্তিগত ভাবে চিরাচরিত প্রথার ট্রেডইউনিয়ন আন্দোলনের পক্ষপাতী নন।

পুরনো ধারা ভাঙছে না, নতুন ধারাও জন্ম নিচ্ছেনা। আট ঘন্টা কাজের দাবী নিয়ে যে এত সোরগোল ইউরোপে, বিশেষ করে পশ্চিম জার্মানীতে আজ আর তার তেমন কোন আবেদন নেই। সেখানে এখন সপ্তাহে ৩৫ ঘন্টা কিংবা ৩৮ ঘন্টা কাজের দাবী-ই প্রধান শিল্প-বিরোধ। অসংগঠিত শ্রমিকদের ক্ষেত্রে এই দাবী তোলা নিরর্থক কিন্তু সংগঠিত শ্রমিকরা এখনই এই দাবী তুলতে পারে। অথবা জাতীয় মজুরি নীতি। এই রাজ্যে ভিন্ন ভিন্ন বেতন কাঠামো আবার কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন সংস্থায় এক এক ধরনের মজুরি-নীতি। মূল্যসূচক ভিত্তিক যে মহার্ঘভাতা তা আগাগোড়াই ভ্রান্ত। হিসেবের কারচুপির ফলে প্রতিবছর শ্রমিকরা কোটি কোটি টাকা পায় না। মালিকদের কনসেসন দেবার ক্ষমতা কমে আসছে বলে যে প্রচার রয়েছে তার কোন যৌক্তিকতা নেই। লাভের হার প্রতি বছরই বাড়ছে, সরকারী অথবা বেসরকারী মালিক কেউই ক্ষয়রাতি করছে না। সবাই লাভের জন্য ব্যবসা করছে। শিল্প রুগ্ন হয়ে যায় অথবা বলা চলে রুগ্ন করে দেওয়া হয়। কিন্তু রুগ্নশিল্প কেনা বেচাই একটা শিল্প। ব্যবসাটা লাভজনক না হলে রুগ্নশিল্পের ব্যক্তিগত ক্রেতা জুটত না। এমন একটা কার্যক্রম দরকার যা প্রথাসিদ্ধ দাবী সনদের পরিপন্থী, এমন একটা দৃষ্টিভঙ্গী দরকার যা ট্রেডইউনিয়নের বাইরেই ট্রেডইউনিয়ন আন্দোলন নিয়ে যেতে সক্ষম। কিন্তু এখনও পর্যন্ত তেমন কোন আশার আলো দেখা যাচ্ছে না। দ্বিতীয়বস্থার বিরোধিতা করতে যারা আসছে তারাও শেষ পর্যন্ত দ্বিতীয়বস্থারই শিকার হয়ে পড়ছে।

# জহরলাল নেহরুর উন্নয়ন পরিকল্পনার জন্মরহস্য

রণজিৎ রায়

[ভারতীয় পরিকল্পনার সামাজিক আন্তরাষ্ট্রীয় পরিণতি সম্পর্কে সাংবাদিক রণজিৎ রায় যে বইটি লিখেছেন, এই প্রবন্ধটি তার ২১শ অধ্যায়। আপাততঃ তিনি তাঁর এই ইংরাজী বইয়ের নাম দিয়েছেন "জওহরলাল নেহরুর সমাজবাদ : প্রচারে ও প্রয়োগে"।]

১৯৪৫ এবং ১৯৫১-র নির্বাচনী ঘোষণায় কংগ্রেস দেশের সামনে তুলে ধরেছিল 'একটা সামাজিক কল্যাণ রাষ্ট্রগোষ্ঠীর' লক্ষ্য। ১৯৫১-র নির্বাচনী পুস্তিকায় বলা হয়েছিল :

"দেশের ভাবী অর্থনৈতিক ও সামাজিক সংগঠনের চরিত্রের চাবিকাঠি এবং তার চালিকাশক্তি নিহিত রয়েছে কংগ্রেস সংগঠনের মধ্যে। কংগ্রেসের লক্ষ্য হল শান্তিপূর্ণ ও বৈধ উপায়ে ভারতে এমন একটি সামাজিক কল্যাণরাষ্ট্র গোষ্ঠীর প্রতিষ্ঠা যার ভিত্তি সকলের জন্য সমান সুযোগের এবং রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক অধিকারের ব্যবস্থা করা বিশ্বশান্তি ও বিশ্বসৌভ্রাত্রের লক্ষ্য সামনে রেখে।"১

পঞ্চাশের দশকের প্রথম দিকে "বর্ণহীন ও শ্রেণীহীন" সমাজ প্রতিষ্ঠার কথাও শোনা গিয়েছিল। ১৯৫৫ সালে সামাজিক কল্যাণরাষ্ট্র গোষ্ঠীর ধ্বনি কংগ্রেস ত্যাগ করল এবং তার বদলে ধ্বনি তুলল "সমাজতান্ত্রিক ধাঁচের রাষ্ট্রের"। জানুয়ারি ১৯৫৯ সালে নেহরুর মৃত্যুর চার মাস আগে কংগ্রেসের ভুবনেশ্বর অধিবেশনে কংগ্রেস সেই লক্ষ্যও পরিত্যাগ করে সাদামাঠা 'গণতন্ত্র ও সমাজবাদের' লক্ষ্য গ্রহণ করল।

মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী নিহত হয়েছিলেন ১৯৪৮ সালে। বল্লভভাই প্যাটেল মারা যান ১৯৫০-এর ডিসেম্বরে। এর পর কি কংগ্রেসে, কি ভারত সরকারে নেহরুর নীতি এবং কর্মধারাকে চ্যালেঞ্জ করার মত আর কেউ থাকল না। নেহরুকে ভারতীয় পরিকল্পনার পিতৃপুরুষ বলে মানা হয়। ১৯৪৭ থেকে ১৭ বছর তিনি ছিলেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী এবং ১৯৫০ থেকে ১৪ বছর পরিকল্পনা কমিশনের সভাপতি। এই আলোচনায় বারংবার আমরা যে তাঁর বিবৃতি ও বক্তব্যের উল্লেখ করেছি তার কারণ ভারতের পরিকল্পনা ও তার পরিণতিতে ঐ সব বক্তব্যের প্রাসঙ্গিকতা রয়েছে ; কারণ তার যে কোন ব্যক্তির চেয়ে স্বাধীন ভারতকে তিনি এমন পথে চালিয়ে দিয়েছিলেন যেখান থেকে মৌলিক প্রত্যাবর্তন কেবল দেশব্যাপী সহিংস অভ্যুত্থান ব্যতীত অসম্ভব। ইন্দিরা গান্ধীর নেতৃত্বে ঐ পথে যাবার গতি দ্রুততর হয়েছে। বুলডোজারী স্লোগান দিয়ে আর কঠিন বাস্তবকে গায়ের জোরে আড়াল করা যাবে না।

"সমাজতান্ত্রিক ধাঁচের সমাজের" প্রস্তাব কংগ্রেস গ্রহণ করেছিল তার আবাদী অধিবেশনে ১৯৫৫-র জানুয়ারিতে। নেহরু যে কেবল অনুপ্রাণয়িতা ছিলেন তা নয়, তিনি ছিলেন স্বয়ং প্রস্তাবের খসড়াকার। প্রস্তাবটি গৃহীত হওয়ার পরে তার উপরে বিপুল উৎসাহ উদ্দীপনার মধ্যে তিনি বলেছিলেন :

"বর্তমান যে প্রস্তাবটির উপজীব্য হল অর্থনৈতিক নীতি নির্ধারণ তার দ্বারা আপনাদের সিদ্ধান্তকেই কার্যে পরিণত করতে হবে কারণ এই অর্থনৈতিক নীতিই শেষ পর্যন্ত ভারতের শেষ চিত্রটিকে রূপায়িত করবে যাকে আপনারা নাম দিয়েছেন সমাজতান্ত্রিক 'ধাঁচ'। অতএব এই প্রস্তাবের গুরুত্ব সর্বাধিক। এই রকম একটা প্রস্তাবকে যত বিস্তৃত ভাবেই কল্পনা করা যাক না কেন, নীতির পুঙ্খানুপুঙ্খ আলোচনায় যাওয়া কখনো সম্ভব নয়। এই সব প্রস্তাবের বিপদ হল এই যে, আপনি হয়ত এর মধ্যে ঘায়েল কথা বা অস্পষ্ট বাক্যাংশ ব্যবহার করেও মনে করতে পারেন যে আপনি দেশের সামনে একটা দারুণ নেতৃত্ব দিয়েছেন। এতে আমার কোন সাহায্য হয় না কারণ

ভারতের বাস্তব সমস্যা নিয়ে আমাদের হাতে কলমে ভাবতে হয়। এই সব সমস্যাকে কী করে মোকাবেলা করা যায় সেটাই একটা বড়ো সমস্যা। বেকারির সমস্যা এবং জনগণের জীবনের মানোন্নয়নের সমস্যার সমাধান সাধারণ সিদ্ধান্ত বা ধ্বনির (স্লোগান) দ্বারা হওয়া সম্ভব নয়। একথা বলতে গিয়ে যারা অবজ্ঞাসূচক ভাষা ব্যবহার করেন তাদের নিন্দা করছি না, কেননা সারা জীবন আমিও তা-ই করে এসেছি, প্রস্তাবের বখেড়া করে তাদের পাস করিয়েছি ইত্যাদি। কিন্তু এমন একটা সময় আসে যখন কথার বাদ্‌ ভুলে কঠিন বাস্তবের মুখোমুখি হতে হয়। এটা কংগ্রেসকর্মীদের প্রতি সর্বাধিক প্রযোজ্য কারণ সরকার পরিচালনায় এবং সরকারী নীতিনির্ধারণে অন্যদের চেয়ে তাদের দায়িত্ব অনেক বেশী।"২

"কথা ভুলবে?" কোন কথা? খোদ কংগ্রেস প্রস্তাবের কথা ভুলে তাহলে কি কংগ্রেস সরকারগুলিকে সুযোগ করে দিতে হবে যাতে তারা কংগ্রেসের সর্বোচ্চ সংস্থার নির্দেশের তোয়াক্কা না করে খুশিমত নীতি নির্ধারণ করে নিতে পারে? যে কোনো লোকের এই ধারণা হওয়াই স্বাভাবিক যে, যে শাসক দল তার প্রস্তাব এবং নীতি গ্রহণ করে তার দ্বারা যাতে সেই দলের মন্ত্রীরা পরিচালিত হতে পারে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, কংগ্রেসের 'সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ' প্রস্তাব' সম্বন্ধেও কেউ যদি এমন ধারণা পোষণ করেন তাহলে বলতে হবে তিনি অজ্ঞ এবং কংগ্রেস দল এবং তার সরকারগুলির কর্ম প্রণালীর ঘোতঘাত সম্পর্কে তিনি কোনোই খবর রাখেন না।

## মিশ্র অর্থনীতিতে পাবলিক সেক্টরের ভূমিকা

দেশকে 'সামবায়িক কল্যাণ রাষ্ট্রগোষ্ঠী' বা 'সমাজবাদী ধাঁচের সমাজ' বা সোজা কথায় 'গণতন্ত্র এবং সমাজবাদে'র স্বর্গে পৌঁছে দেবার কংগ্রেস অনুসৃত পথের নাম নাকি মিশ্র অর্থনীতি। কিন্তু এই কথা দুটোর সঠিক অর্থ কী বা তাদের অন্তর্গত অর্থভেদই বা কী নেহরু তার ব্যাখ্যা সযত্নে এড়িয়ে গেছেন। শিল্পপতিরা হয়তো জানতেন কংগ্রেস এই কথা বলে কী করতে চায়। কাজেই এই লক্ষ্যের বিষয়ে একমত হতে তাদের কোন অসুবিধা হয়নি। ১৯৫৫ সালে নয়াদিল্লীতে একদল শিল্পপতিকে সম্বোধন করে নেহরু বলেছিলেন:

"আমরা বলি এবং সুখের কথা যে, আপনারাও স্বীকার করেন যে, আমরা চাই একটা সমাজতান্ত্রিক নক্‌শার মতো সমাজ। এই বাক্যাংশটার মানে হল, একরকম সমাজবাদ। এমন কল্পনাও করবেন না যে, এর মানে সমাজবাদ ছাড়া আর কিছু। সমাজবাদী নকশার মতো, তার মানে হল সমাজবাদ। কিছু লোক সমাজবাদী নকশা, সমাজবাদী ধাঁচ এবং সমাজবাদ—এই তিনের মধ্যে পার্থক্য খুঁজে পান। এরা অবিকল এক জিনিস—বিন্দুমাত্র প্রভেদ নেই। কিন্তু সাধারণ ভাবে এদের বর্ণনা করা ছাড়া সুনির্দিষ্টভাবে এদের সংজ্ঞা নিরূপণ করা কারো পক্ষে সম্ভব নয়।"৩

কিন্তু কিছু কংগ্রেস সদস্য এই লক্ষ্যের নির্দিষ্ট সংজ্ঞা দেওয়ার জন্য হেঁচে কর্মছিলেন। ১৯৫৭ সালে নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির ইন্দোর অধিবেশনে প্রশ্নটি উঠে পড়ল। তখন নেহরু যতটুকু বলতে প্রস্তুত ছিলেন তা হল এই:

"আমাদের অনেক বন্ধু এবং সহকর্মী (যার মধ্যে অন্য দলের লোকেরাও আছেন) সমাজবাদ সম্পর্কে কথা বলেন। আমার মতে (সসম্মানেই বলছি) অত্যন্ত অনমনীয় ভাবে.....আমি তো ভেবে পাই না সমাজবাদের নির্দিষ্ট এবং অনমনীয় সংজ্ঞা দিতে আমাকে কেন বলা হচ্ছে।৪

গণ পরিষদের আইন প্রণয়ন শাখায় সরকারের শিল্পনীতি বিষয়ক প্রথম প্রস্তাবের উপরে ১৯৪৮ সালে বলতে গিয়ে দেখা যায় নেহরু 'মিশ্র অর্থনীতি' কথাটা প্রথম ব্যবহার করেছেন। এই অর্থনীতিকে মিশ্র বলা হয়েছে এই কারণে যে, সরকারী শিল্পক্ষেত্রের পাশাপাশি একটা বেসরকারী শিল্পক্ষেত্রের অস্তিত্বও স্বীকৃত হয়েছে যার মালিকানা ব্যক্তিগত ভাবে শিল্পপতিদের। আমাদের দেশে মিশ্র অর্থনীতিকে বলা হয়েছে 'উত্তরকালীন পর্যায়'।৫ যার পরে আসবে 'সমাজবাদী নকশার সমাজ' বা 'সমাজবাদী ধাঁচের সমাজ' বা 'গণতন্ত্র ও সমাজবাদ'। 'সমাজবাদী সেক্টর'গুলির কথা না হয় ছেড়েই দেওয়া যাক।

নিজেকে খোলাখুলি ধনতন্ত্রী বলে জাহির করে এমন কোনো দেশ বা রাষ্ট্র আজকের পৃথিবীতে কোথাও আছে কি যেখানে বেসরকারী শিল্পক্ষেত্রের পাশাপাশি একটা সরকারী শিল্পক্ষেত্র নেই? এমন কি পাকিস্তান পর্যন্ত তাদের বিরাট বেসরকারী শিল্পক্ষেত্র সম্পর্কে গর্ব করে থাকে। বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ নিজেই এই উপমহাদেশে সরকারী শিল্পক্ষেত্র স্থাপন করেছিল যার উত্তরাধিকারী এখন ভারত এবং পাকিস্তান। আমাদের জাতীয় নেতারা বলে থাকেন যে, তারা ভারতের মনীষা অনুযায়ী সমাজবাদ গড়ে তুলছেন। ১৯৭৬ সালে আমাদের সংবিধান সংশোধন করে আমাদের দেশকে বলা হল সমাজবাদী সাধারণতন্ত্র। পাকিস্তানী নেতারা দাবি করেন যে তারা ঐসলামিক রীতিনীতি অনুযায়ী সমাজবাদ গড়ে তুলছেন। হিটলার পর্যন্ত তার জার্মানীকে বলতেন 'জাতীয় সমাজবাদী'।৬ পাকিস্তানে সরকারী শিল্পক্ষেত্রের গুরুত্ব সম্পর্কে সেখানকার অর্থনীতিবীদ একজন মুখপাত্র লিখেছেন :

'প্রয়োগের ক্ষেত্রে পাকিস্তানে মিশ্র অর্থনীতির ধারণা বা অবে বিগত তিন দশকে যে পরিবর্তন ঘটেছে তার মধ্যে দিয়ে ফুটে উঠেছে দেশের প্রগতি ও সমৃদ্ধির ক্ষেত্রে সরকারী শিল্পক্ষেত্রের একচ্ছত্র ভূমিকা। ৭০-এর বছরগুলির প্রথম থেকেই···অর্থনীতির উঁচু পদক্ষেপগুলি রাষ্ট্রীয় তত্ত্বাবধানের আওতায় চলে আসে।'৭

৭০-এর প্রথম বছরগুলিতে এ দেশেও আমাদের বলা হয়েছিল যে, সরকারী শিল্পোদ্যোগ অর্থনীতির 'উঁচু পদক্ষেপে' পৌঁছে গেছে। আমাদের 'মিশ্র অর্থনীতিতে' সরকারী শিল্পোদ্যোগের সত্যিকারের ভূমিকাটা কী? আমাদের জাতীয় নেতারা, বিশেষতঃ সবচেয়ে বেশী নেহরুজী, কেন সরকারী শিল্পোদ্যোগের দিকে ঝুঁকেছিলেন? স্বয়ং নেহরু এ বিষয়ে নয়াদিল্লীতে ১৯৫০ সালে একদল শিল্পপতির কাছে কী বলেছিলেন শোনা যাক :

'আমেরিকায় ব্যক্তিগত উদ্যোগ এমন এমন ভাবে বিকাশ লাভ করেছিল যে, শীঘ্রই তা নিজের জন্য এমন একটা শক্তিশালী ভিত্তি তৈরি করল যার সম্পদের পরিমাণ অপরিসীম। ভারতের ব্যক্তিগত উদ্যোগের কি সে রকম কিছু করবার মত দক্ষতা, ক্ষমতা বা সম্পদ আছে? এর ক্ষমতা এবং সম্পদ হয়ত আছে কিন্তু নিজের একক চেষ্টায় এই সমস্যা সমাধান করার মত শক্তি বা দক্ষতা এর নেই। এটা একটা সহজ কথা যে, আপনারা এটা করতে পারেন না। আমাদের বেসরকারী অর্থাৎ ব্যক্তিগত উদ্যোগে আমাদের নদী উপত্যকার প্রকল্পগুলির ভার নেওয়া সম্ভব কি? তা সম্ভব নয়, কারণ এই কাজের পরিমাণ তাদের ক্ষমতার বহুগুণে বেশী। এদের কাছ থেকে দ্রুত লাভের সম্ভাবনা নেই। তার জন্য বহু বছর অপেক্ষা করতে হবে। কাজেই অগত্যা রাষ্ট্রকেই তার ভার গ্রহণ করতে হবে·····। ব্যক্তিগত উদ্যোগকে যদি সম্পূর্ণভাবে কাজে লাগানো যায় তাহলে এদেশে তার প্রথম বলি হবে ব্যক্তিগত উদ্যোগ। আমি সাধারণভাবে বলছি। অকপটে আপনাদের কিছু বলতে গেলে বলতে হয় যে, এদেশের ব্যক্তিগত উদ্যোগ যথেষ্ট জ্ঞান সঞ্চয় করেনি। টাকা তুলার ব্যাপারে এ হয়তো খুব চতুর কিন্তু সত্যিকারের জ্ঞানের ব্যাপারে এর ঘাটতি আছে।'৮

অতএব সরকার নিজের উপরে ভার তুলে নিল সেই সব শিল্প গড়ে তোলার যাদের কাছ থেকে দ্রুত লভ্যাংশ পাওয়ার আশা নেই। আর যে সব শিল্প থেকে দ্রুত লভ্যাংশ পাওয়া যায় তা দেওয়া হল ব্যক্তিগত অর্থাৎ বেসরকারী উদ্যোগকে। বিগত তিন ও অর্ধ দশকের পরিকল্পনাগুলির মধ্যে দিয়ে ব্যক্তিগত উদ্যোগ এত বিপুল পরিমাণ সম্পদের পাহাড় জমিয়ে তুলেছে (সাদা ও কালো দুই-ই) যে, পরিকল্পনার আরম্ভকালে যে শিল্পোদ্যোগের ক্ষেত্রে প্রবেশ করার শক্তি তার ছিল না সেখানে প্রবেশ করার ক্ষমতা আজ তার হয়ে গেছে।

ভারতে সরকারী শিল্পোদ্যোগের ক্ষেত্রকে অনেক সময় 'সমাজবাদী ক্ষেত্র' বলে বর্ণনা করা হয়। সরকারী উদ্যোগের ক্ষেত্রে বিনিয়োজ্য মূলধন এসেছে করদাতাদের পকেট থেকে নানা রূপে। ভারত সরকারের বার্ষিক বাজেটের প্রধান ভাণ্ডার হল পরোক্ষ কর। এর আঘাত সবচেয়ে পড়েছে দরিদ্র শ্রেণীর উপর। এই মূলধনের অংশ এসেছিল বৈদেশিক ঋণ হিসেবে। সুদে সমেত এই ঋণ শোধের বোঝাও প্রধানত পড়েছে গরিব করদাতাদের উপরে পরোক্ষ করের মাধ্যমে। "আপনি, আমি এবং আরো কোটি কোটি ভারতবাসী এই 'সরকারী শিল্পোদ্যোগ ক্ষেত্রকে গড়ে তোলার জন্য অর্থ জুগিয়েছি"

বলেছেন শ্রীপি. এন. হাকসর, যিনি ১৯৬৭-৭২ ছিলেন প্রধানমন্ত্রীর সচিব এবং তার পরে পরিকল্পনা কমিশনের ডেপুটি চেয়ারম্যান। সরকারী শিল্পোদ্যোগ ক্ষেত্র সম্পর্কে তিনি লিখেছিলেন :

"পরিচালনার এবং উৎপন্ন দ্রব্যের মানের ক্ষেত্রে যদি বিশৃঙ্খলা দেখা দিয়ে থাকে তাহলে তার কারণ হল, সরকারী শিল্পোদ্যোগের উৎপন্ন দ্রব্যের বিতরণ এবং মূল্যনিরূপণ করা হিসাব করা হয়েছিল ব্যক্তিগত উদ্যোগ ক্ষেত্রের ব্যক্তি অর্থাৎ মালিকদের সম্পদ ( লিখিত এবং অলিখিত দুই-ই) বাড়ানোর জন্য" ৯

এই একই প্রসঙ্গে যোগ করা যায় গানার মির্দালের একটি মন্তব্য :

"ব্যক্তিগত শিল্পোদ্যোগ তার প্রভাব খাটিয়েছে সরকারী উদ্যোগে প্রস্তুত উৎপন্ন দ্রব্যের এবং সেবার দাম কমিয়ে রাখতে।" ১০

অবধারিত ভাবে এটাই হচ্ছে আসল কারণ, যে জন্য 'মিশ্র' অর্থনীতির' প্রয়োজন। নেহরু এটার পক্ষে ওকালতি করেছিলেন একটা আপস হিসেবে, কেননা, ক্রান্তিকালে এ ছাড়া অন্য পথ ছিল না। তার বক্তব্যের ভাষা :

"আপস সবাইকে করতে হয়। যদিও এই প্রসঙ্গে বা যে কোনো প্রসঙ্গে "আপস" শব্দটাকে আমি ঘৃণা করি, তবু একে এড়ানো যায় না। এর ফলে আমরা অর্থনীতির একটা ক্রান্তিকালীন পর্যায়ে চলে আসি। একে যে নামে খুশি ডাকতে পারেন—মিশ্র অর্থনীতি বা অন্য কিছু।" ১১

## ওয়াশিংটনে বেসরকারী উদ্যোগের ভূমিকা সম্পর্কে রাজীব গান্ধী

আমাদের মিশ্র অর্থনীতিতে সরকারী উদ্যোগের ভূমিকা সম্পর্কে নেহরুর সংজ্ঞানিরূপণের তিন ও অর্ধ দশক পরে তার দৌহিত্র রাজীব গান্ধী ১৯৮২ সালের জুলাই মাসে প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর যুক্তরাষ্ট্রে সরকারী সফরের সঙ্গী হয়েছিলেন। নিঃসন্দেহে রাজীব গান্ধীকে তার মাতা এবং ভারত সরকারের কানুন আধলারা শিখিয়ে পড়িয়ে নিয়েছিলেন। আমেরিকান সেনেটের বৈদেশিক সম্পর্ক সমিতির সভায় ভারতে বেসরকারী উদ্যোগ এখন কোন ভূমিকা গ্রহণ করতে পারে তার উপরে আলোচনা। ঐ সভার ইউ-এন-আই প্রেরিত প্রতিবেদনে বলা হয়েছে :

'ওয়াশিংটন, জুলাই ৩০, গতকাল সিনেট বৈদেশিক সমিতির সভায় যোগদান করে শ্রীরাজীব গান্ধী কমিটির চেয়ারম্যান চার্লস পার্সি'র প্রভূত প্রশংসা লাভ করেছেন।

'সভার শেষে মিঃ পার্সি' সাংবাদিকদের বলেন যে; তিনি ( রাজীব ) ভারতের অর্থনৈতিক বিকাশের সম্ভাবনা ব্যাখ্যা করতে গিয়ে 'একটা চমৎকার বিবৃতি' দিয়েছেন।

'মিঃ পার্সি' বলেছেন যে, তিনি যখন শ্রীগান্ধীকে জিজ্ঞাসা করলেন যে, ভাবী প্রজন্মের একজন হয়ে এ সম্পর্কে তার মতামত কি, তখন তিনি বললেন যে, ভারত যখন স্বাধীন হয় তখন শিল্পের ক্ষেত্রে নিচু তলার সংগঠন ছিল না এবং ব্যক্তিগত মালিকেরাও প্রয়োজনীয় মূলধন নিয়ে এগিয়ে আসেননি। কাজেই সেনেটর বলছেন, শ্রীগান্ধীর মতে 'সবই করতে হয়েছে সরকারকে'।

'কিন্তু তার পরে যখন মৌলিক ভিত্তি স্থাপিত হয়ে গেল তখন বেসরকারী ক্ষেত্র আরো বড়ো ভূমিকা পালন করতে পারত।' ১২

'মিশ্র অর্থনীতি' তার কাজ ভালই করেছে : বেসরকারী ক্ষেত্রের ক্ষমতা এর দ্বারা গড়ে উঠেছে। এটা ঘটাতে গিয়ে সরকারকে যে প্রক্রিয়া অবলম্বন করতে হয়েছে তা হল সরকারী উদ্যোগে নির্মিত মারফত উৎপন্ন দ্রব্যগুলি ব্যক্তিগত মালিকানার কাছে সস্তায় বিক্রি করা যাতে তার দ্বারা তারা ব্যবহার্য দ্রব্য উৎপন্ন করে; হাকসারের মতে হিসাবের মধ্যে এবং হিসাবের বাহিরে বিরাট মুনাফা লাভ করতে পারে। সংস্থাগুলিকে দিয়ে বিপুল ক্ষতি বা সামান্য মুনাফার ভার বহন করানো হয়েছে। হাকসার ১৯৭১-৭২ সালের সরকারী উদ্যোগের কার্যকলাপের নিম্নোক্ত হিসাব দিয়েছেন।

"সরকারী উদ্যোগ ক্ষেত্রের কার্যকারিতা সম্পর্কে দেখা যায় ১৯৭১-৭২-এর শেষে রেলওয়ে, (ডাক ও তার বিভাগের মত) বিভাগীয় খাতা বাদে নিমাণ, ব্যাংকিং এবং অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠানে ৫০৫২ কোটি টাকার মত বিপুল টাকা লগ্নি করে ১৯৭১-৭২ সালের শেষে লাভ হয়েছিল ৯ কোটি টাকা মাত্র।"

এই টাকাটা যদি শতকরা ১০ টাকা সুদে ব্যাংকে আমানত রাখা যেত তাহলে এক বছরে সরকারের সুদে আসত ৫০৫ কোটি টাকা। কিন্তু তাহলে যে বেসরকারী শিল্পোদ্যোগ ক্ষেত্রের শক্তি গড়ে ওঠে না। এ হল আমাদের 'মিশ্র অর্থনীতির' একটা দিক।

মূলধনের সমাবেশ ছাড়া কি সরকারী, কি বেসরকারী কোন শিল্পোদ্যোগ ক্ষেত্রে উন্নয়নমূলক অর্থনিয়োগ হতে পারে না। সরকারের সব সময়েরই ভাবনা হয়েছে কী করে মূলধনের সমাবেশ করা যায়। ব্যবসায়ী সম্প্রদায়গুলির হাতে বিপুল মূলধনের আকর হয়েছে কালো টাকা। এ সম্বন্ধে যত আইন এবং তদন্ত কমিশনই নিয়োগ করা হয়ে থাক না কেন, কালো টাকার বৃদ্ধি ঘটেছে দুর্বার গতিতে এবং এখনো তা ঘটেই চলেছে। এর একাংশ যায় শিল্পবিনিয়োগে কিন্তু এর সিংহ ভাগ খাটে ব্যবসায় বাণিজ্যে। বৈদেশিক ঋণ এবং দান, সরকারী ভাষায় যার নাম 'বৈদেশিক সাহায্য' এই মূলধনের আর এক উৎস। ১৯৮০-৮১ পর্যন্ত বিদেশি সাহায্যের প্রাপ্ত এবং ব্যয়িত পরিমাণ মোট ২২,৭৬৩ কোটি টাকা। ১৪ শতাংশ হল আন্তর্জাতিক অর্থভাণ্ডার থেকে ৩০০০ কোটি টাকার চুক্তি সম্পাদনের আগেকার পরিমাণ যার মধ্যে পি-এল ৪৮০ বাবদ প্রাপ্ত ১৫৩০ কোটি টাকা ধরা হয়নি, যে ঋণ মার্কিণ সরকার মকুব করে দিয়েছে। ফলের আকারে স্বাভাবিক যেসব সাহায্য পাওয়া যায় তা প্রায় সুদসমেত সরকারের এই তহবিল থেকে শোধ দিতে হয়।

## করনির্ধারণ নীতি ও অসাম্য

প্রত্যক্ষ করের ফলে যেমন দাম কমে, পরোক্ষ করের ফলে তেমনি দাম বাড়ে। পরোক্ষ করের বোঝা সবচেয়ে বেশী পড়ে গরীব সাধারণের উপর আবার প্রত্যক্ষ কর বহন করতে হয় ধনী লোকদের। অতএব অসাম্য কম করার একটা উপায় হল প্রত্যক্ষ কর, আর পরোক্ষ কর হল সেই অসাম্যকে বাড়ানোর উপায়। পরিকল্পনা কমিশনের প্রাক্তন ডেপুটি চেয়ারম্যান ডি. আর গ্যাডগিল দেখিয়েছেন কেমন করে সরকারের কর নির্ধারণ নীতি সম্বন্ধের অসাম্য লাঘবের কর্তব্যে অবহেলা দেখিয়েছে। বস্তুত এই নীতির ফলে বিপরীত ফল লাভ ঘটেছে। কারণ পরিকল্পনার শুরু থেকে সরকার প্রত্যক্ষ করের পরিমাণ কমিয়ে পরোক্ষ কর বাড়িয়ে চলেছে।

১৯৫০ থেকে দু দশক ধরে কেন্দ্রীয় এবং রাজ্য সরকারগুলির করপ্রাপ্ত রাজস্বের মধ্যে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ করের অনুপাতিক হার হিসেব করলে দেখা যাবে :

"জাতীয় আয়ের ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষ করের অনুপাত কম-বেশি একই রয়েছে ২.১ শতাংশে আর সেই ক্ষেত্রে পরোক্ষ করের পরিমাণ এই কুড়ি বছরে ক্রমবর্ধমান হয়ে ১৯৫০-৫১ সালের ৪.২ শতাংশ থেকে ১৯৬৯-৭০-এ দাঁড়িয়েছে। ১০.৪ শতাংশে। পরিকল্পনার বছরগুলিতে সরকারী কর-রাজস্বে এই বিপুল আনুপাতিক বৃদ্ধির কারণ পরোক্ষ করের উত্তরোত্তর পরিমাণে বৃদ্ধি। দেখা যাবে যে, ১৯৫০-৫১ সালে সমগ্র রাজস্বের মধ্যে পরোক্ষ কর বাবদ আয়ের অনুপাত যখন ছিল ৬০ শতাংশে, ৬০-৬১ সালে তা হল ৭০ শতাংশে এবং ৭০-৭১ সালে তা আরো বেড়ে দাঁড়াল ৭১ শতাংশে।" ১৫

আয়ের আসাম্যের উপরে এই করনির্ধারণ নীতির অভিঘাত সম্পর্কে ঐ পর্যবেক্ষণে বলা হয়েছে :

"উপর থেকে দেখতে গেলে এই করনির্ধারণনীতি আয়বণ্টনের অসাম্যের সমস্যার উপরে তেমন কোন প্রভাব ফেলতে পারেনি এবং তার ফলে ভারতের অর্থনৈতিক এবং সামাজিক প্রতিক্রিয়ার তার প্রভাবও খুব বেশী হয়নি। বরং বিপরীত দিকে অন্তত তৃতীয় পরিকল্পনার কাল পর্যন্ত আয়বণ্টনের অসাম্যের সমস্যা আরো খারাপের দিকে যাচ্ছিল।"১৬

ভারত সরকারের করনির্ধারণনীতি হল এমন একটি জিনিস যার দ্বারা আমাদের অর্থনৈতিক বিকাশের প্রকৃতি স্থিরীকৃত হয়। রাজ্য সরকারের করনির্ধারণ নীতিগুলির অভিঘাত সে তুলনায় নামমাত্র। কেন্দ্রীয় সরকারের কররাজস্বের মোটামুটি হিসেব থেকে দেখা যায় ১৯৫০-৫১ সালে প্রত্যক্ষ কর থেকে প্রাপ্তির পরিমাণ ৪০ শতাংশ এবং পরোক্ষ কর থেকে ৬০ শতাংশ। প্রথম পঞ্চবার্ষিক শেষ বছরে ১৯৫৫-৫৬ সালে এই সংখ্যাগুলি ছিল যথাক্রমে ৩১ শতাংশ এবং ৬১ শতাংশে আর ১৯৭০-৭১ সালে

২০ শতাংশ এবং ৮০ শতাংশে। পরিকল্পনার প্রথম দুই দশকে প্রত্যক্ষ করের ভার ৪০ থেকে ২০ শতাংশে নামিয়ে এনে পরোক্ষ করের ভার ৬০ থেকে ৮০ শতাংশে ঠেলে তোলা হল।১৭ বিগত এক ও অর্ধ দশকে কেন্দ্রীয় সরকারের রাজস্ব আয়ে পরোক্ষ করের অনুপাত প্রভূত বৃদ্ধি লাভ করেছে। এটা অবশ্য মুদ্রাস্ফীতি থেকে আলাদা, যে মুদ্রাস্ফীতি হল নিকৃষ্টতম পরোক্ষ কর।

কারো করনির্ধারণনীতি যদি এমন হয় যা অসাম্যকে তীব্রতর করে তাহলে তার সঙ্গে এমন শিল্পনীতি থাকা দরকার যা আমাদের মত দরিদ্র দেশে সেই সব বিলাসদ্রব্য তৈরি উৎসাহিত করবে যা কেবল ধনীরাই কিনতে পারে। যে সব শ্রমশিল্পে সুতী কাপড়ের মত জনতা-ব্যবহার্য দ্রব্য উৎপন্ন হয় তাকেই অবহেলা করা দরকার। আমাদের পরিকল্পনার এই দিকটা পর্যবেক্ষণ করে দেখা গেছে :

"উচ্চ আয়সম্পন্ন গোষ্ঠীগুলির ব্যবহারবিধিতে আবশ্যিক উপকরণ রূপে স্থান লাভ করে এমন জিনিসের উৎপাদন প্রসারের হার দ্রুততায় অন্য সব কিছুকে ছাড়িয়ে গেছে। মধ্যবিত্ত গোষ্ঠীগুলির ব্যবহার্য জিনিসগুলির উৎপাদনেও তাৎপর্যপূর্ণ বৃদ্ধির হার লক্ষ্য করা গেছে। অবশ্য কাটা কাপড়, চিনি প্রভৃতি জনতার ব্যবহার্য পণ্যের উৎপাদনে তেমন কোন বৃদ্ধির হার লক্ষিত হয়নি। পরিকল্পনাগুলিতে যে সব শিল্পের উপর বিকাশ ব্যাপারে সবচেয়ে কম অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে সেই শিল্পেই উৎপাদন বেড়েছে সব চেয়েবেশি। এর দ্বারা প্রমাণ হচ্ছে যে, সংশ্লিষ্ট আয়সীমা, সর্বশেষ উৎপাদন এবং তন্মধ্যবর্তী জিনিসের উৎপাদন (আমদানী শুল্ক এবং আমদানী শুল্ক সমেত) শিল্পে সম্পদের অপচালনের দ্বারা নিম্ন অগ্রাধিকারের এলাকায় তার ব্যবহারকে প্রতিহত করতে পারেনি।" ১৮

## মুদ্রাস্ফীতি : ব্যবসায়ীদের হাতে সম্পদ হস্তান্তরের উপায়

আমাদের মত হতদরিদ্র দেশ যেখানে মোট জনসংখ্যার অর্ধেক দারিদ্র্য সীমার নিচে বাস করে সেখানে নিচু অগ্রাধিকার অঞ্চল কথাটা অনাবশ্যক বক্র। প্রস্তুতকারী শ্রমশিল্পকে আসল নাম এড়িয়ে মিষ্টি করে ডাকার মত। এই সব শিল্পের বিস্তারই হয়েছে সর্বাধিক। যুগপৎ কেন্দ্র উচ্চ থেকে উচ্চতর হারে মুদ্রাস্ফীতি ঘটিয়ে জিনিসের দামের সিঁড়ি উপরে ঠেলে দিয়েছে। এর ফলে দরিদ্র জনাংশের হাত থেকে সম্পদ 'ক্রমবর্ধমান' ভাবে হস্তান্তরিত হয়েছে বিত্তবান জনাংশের, প্রধানত শিল্পপতি ও ব্যবসায়ীদের হাতে।

মুদ্রাস্ফীতি কী করে এই ধরনের সম্পদের হস্তান্তর ঘটায় তার একটা সহজ দৃষ্টান্ত দেওয়ার চেষ্টা করা যেতে পারে। যে সব দৃষ্টান্ত নেওয়া হবে তার মধ্যে প্রধান ক্ষতিগ্রস্ত সম্প্রদায় হল মধ্যবিত্ত শ্রেণী যারা তাদের সঞ্চয়ের টাকা রাখে জীবনবীমার ব্যাঙ্কে এবং প্রভিডেন্ট ফান্ডে; এবং সংগঠিত শ্রমশিল্পের শ্রমিক শ্রেণী যাদের সঞ্চয়ের টাকা প্রভিডেন্ট ফান্ডে ন্যস্ত থাকে। এই সব সঞ্চয় প্রায়শ দীর্ঘকালীন।

আর্থিক সংগঠনগুলি থেকে ঋণ গ্রহীতার অধিকাংশ হল শিল্পপতিরা এবং ব্যবসায়ীরা। ধার করা টাকা দিয়ে তারা গড়ে তোলে জড় সম্পদ যথা কারখানা, শিল্পোৎপাদনের উপযোগী যন্ত্রাদি, কাঁচা মাল, পণ্যের ভবন এবং বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে দ্রব্যের ভাণ্ডার যাদের প্রত্যেকের দাম মুদ্রাস্ফীতির সঙ্গে আনুপাতিক বৃদ্ধি পায়। সোজা কথা বলতে গেলে এরা যে ঋণধন দিয়ে ব্যবসা চালায় শুরু তার ৮০ শতাংশ আসে এই সব আর্থিক প্রতিষ্ঠান থেকে।

অপর দিকে আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলিতে ন্যস্ত সঞ্চয়ের প্রকৃত দাম দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে কমে যেতে থাকে। সঞ্চিত অর্থ সঞ্চিত রাখার সময়ের দাম এবং ঐ অর্থ ফেরত নেওয়ার সময়ের দামের যে পার্থক্য, সেই ক্ষতি আমানতকারীকে স্বেচ্ছায় দিতে হয়। এই সব আমানতের জন্য ভারত সরকারের স্থিরীকৃত সুদের হার এমন যে তার দ্বারা এই ধরণের ক্ষতি পূরণ হতে পারেনা। আমানতকারীদের সৌজন্যে ঋণগ্রহীতা অর্থাৎ শিল্পপতি ও ব্যবসায়ীরা লাভের কড়ি গোণে। তাদের ঋণধন বেড়ে চলে। কালোটাকার যে পর্বতপ্রমাণ পরিমাণ বাজারে খাটছে, যা ব্যবসায়ী সম্প্রদায়গুলির হাতে বিপুল পরিমাণ ঋণধনের যোগান এনে দিয়েছে—আগেকার আর্থিক

সংস্থাগুলি তা থেকে সম্পূর্ণ অ লাদা।

১৯৭০-৭১-কে ভিত্তিবর্ষ (১০০) ধরে পাইকারী দরের সূচক সংখ্যা ১৯৮০-৮১তে দাঁড়িয়েছিল ২৫৭'০ টাকা। অপর কথায়, এই কয় বছরে এক টাকার সত্যিকারের দাম কমে দাঁড়িয়েছিল ৩১ পয়সা। তার মানে হল ১৯৭০-৭১ সালে রাখা ১০০০ টাকা আমানতের আসল দাম ১৯৮০-৮১ সালে ৩৯০ টাকার বেশী ছিল না। মনে করা যাক যে, ব্যাঙ্কে আমানতের উপর সুদের হার বার্ষিক ১০ শতাংশ সরল সুদ। সব রকমের সুদের হারের ক্ষেত্রে প্রচলিত চড় সুদের চেয়ে বেশি। ১০ শতাংশ সরল সুদে ১৯৭০-৭১ সালে আমানতী ১০০০ টাকা ১৯৮০-৮১ সালে ২০০০ টাকা হল। কিন্তু ইতিমধ্যে মুদ্রাস্ফীতির ফলে ১৯৮০-৮১ সালে ২০০০ টাকার সত্যিকারের দাম দাঁড়াল ৩৯০ + ২ = ৭৮০ টাকা। সত্যিকারের অর্থে আমানতকারীকে ক্ষতি সহ্য করতে হল ২০০ টাকা করে ১৯৭০-৭১ সালে ব্যাঙ্কে আমানত রাখা প্রতি হাজার টাকার জন্য। এই ক্ষতির অঙ্কটা হল সেই টাকা যা মুদ্রাস্ফীতির কারণে আমানতকারীর কাছ থেকে ঋণগ্রহীতার অর্থাৎ শিল্পপতি ও ব্যবসায়ীদের হাতে হস্তান্তর করা হয়েছে। যার ফেরত দেওয়ার সময় ঋণগ্রহীতারা যে পরিমাণ টাকা ধার নিয়েছিলেন তাই ফেরত দিলেন, ইতিমধ্যে টাকার সত্যিকারের মূল্য কমে গিয়ে যা-ই দাঁড়িয়ে থাকুক না কেন।

মুদ্রাস্ফীতির আর এক দল শিকার হলেন সরকারী পেনশনভোগীরা। অবসর গ্রহণকালে তারা একটা বাঁধা অঙ্কের পাওনাদার হন। বছরের পর বছর ধরে তত্ত্বাবধায়ক-ই তারা দেখেন যে, তাদের প্রাপ্ত পেনসনের সত্যিকারের মূল্য কমে গেছে। বেতনভোগী এবং মজুরিভোগী শ্রেণীগুলিকেও মুদ্রাস্ফীতির দাম কঠিন ভাবে মেটাতে হয়। বেতন এবং মজুরি চিরদিন মূল্যবৃদ্ধির পিছনে চলে। ভারত সরকারের শ্রম ব্যুরো কর্তৃক প্রস্তুত একটি প্রতিবেদনে দেখানো হয়েছে যে, যে সব শ্রমশিল্পের শ্রমিকের আয় মাসিক ৪০০ টাকার কম, ১৯৬১ সালের তুলনায় ১৯৭৩ সালে তাদের সত্যিকারের আয় ৩০ শতাংশ কম হয়েছিল। ১৯

১৯৮০ সালে ইন্দিরা সরকারের অর্থমন্ত্রী শ্রীআর, ভেঙ্কটরমণকে প্রশ্ন করেছিলাম যে, সুদের হার এমন ভাবে স্থির করা যায় কিনা যাতে আমানতকারী সত্যিকারের মূল্যে অন্তত তার আমানতরাশি অঙ্কের সমতুল মূল্য ফেরত পেতে পারেন কোন আর্থিক প্রতিষ্ঠান কত বছর যাবৎ টাকাটা আমানত রাখা হয়েছিল তার বিচার না করেই অর্থাৎ লাভও নয়, ক্ষতিও নয়—এই রকম একটা ব্যবস্থা।

অর্থমন্ত্রীর জবাব ছিল প্রাঞ্জল এবং দৃঢ় "না, এটা হতে পারে না।" তিনি অবশ্য যোগ করেছিলেন যে, তিনি জানেন যে, "মধ্যবিত্ত শ্রেণীগুলি ক্ষতিগ্রস্ত হয় কারণ তারাই তাদের সঞ্চয় ব্যাঙ্কে, জীবনবীমা ইত্যাদিতে গচ্ছিত রাখে। ব্যবসায়ী সম্প্রদায়গুলি হল ঋণগ্রহীতা। শিল্পপতিরা এবং ব্যবসায়ীরা ব্যাঙ্কে যেই টাকাই আমানত রাখুক না তারা সেখান থেকে ধার নেয়।"

আমানতকারীর সঞ্চয়ের প্রকৃত মূল্য রক্ষা করার জন্য যে কোন ব্যবস্থা আমরা যে মিশ্র অর্থনীতিকে পুষ্ট করে আসছি, তাকে বানচাল করে দেবে।

## ঔপনিবেশিক অর্থনৈতিক কাঠামোর পরিবর্তন নেহরুর মতে ধ্বংসসাধন

১৯৬৮ সালের ২৭ ফেব্রুয়ারী গণপরিষদের (আইন) সভায় ভারতের সামাজিক অর্থনৈতিক লক্ষ্য সম্পর্কে একটি বেসরকারী প্রস্তাব সম্বন্ধে আলোচনা হয়েছিল। মধ্যপ্রদেশ ও বেরারের কাজী সৈয়দ করিমুদ্দিন কর্তৃক প্রস্তাবটি ছিল :

"এই সভা এই অভিমত প্রকাশ করছে যে, এই দেশের অর্থনৈতিক নকশা হবে সমাজবাদী অর্থনীতি যার ভিত্তি হবে মূল শিল্পের জাতীয়করণের নীতি ও সামষ্টিক ও ঘোষ খামার ও দেশের বস্তু সম্পদের সামাজিকীকরণ এবং ভারত সরকার এই নীতিগুলি অবিলম্বে গ্রহণ করবে।" ২০

আলোচনাকালে জাতীয় পরিকল্পনা কমিটির সুপারিশের উল্লেখ হয়েছিল। ১৯৩৮ সালে তৎকালীন কংগ্রেস সভাপতি সুভাষচন্দ্র বসু জহরলাল নেহরুকে চেয়ারম্যান এবং কে, টি শাহকে সম্পাদক করে এই কমিটি গঠন করেছিলেন। আলোচনায় অংশ গ্রহণ করে নেহরু বলেছিলেন যে, কমিটি "অনেক ভাল ভাল কাজ" করেছিল

এবং "বহু সার-কমিটি" "প্রতিবেদন" প্রচার করেছিল কিন্তু "দুঃখের বিষয় এই সব প্রচেষ্টা কোন চূড়ান্ত প্রতিবেদনে প্রতিফলিত হয়নি"।

তাহলে আলোচ্যমান প্রস্তাবের কী হবে? নেহরু তার একটা জোরালো জবাব দিয়েছিলেন:

"আমার ধারণায় আসেনা কোন সরকার, অর্থনৈতিক সমস্যা সম্পর্কে তার অভিমত যাই হোক না কেন, কেমন করে এমন একটা প্রস্তাব গ্রহণ করতে পারে। আমাদের দেশের পরিস্থিতি বিবেচনা করতে গিয়ে সব ঘটনাই আমাদের খতিয়ে দেখতে হবে, সেইভাবে পরিকল্পনা করতে হবে এবং এগিয়ে যেতে হবে, ধীর পদক্ষেপে, যাতে ভাল কিছু গড়ে তোলার আগেই যা আছে তাকে আমরা ভেঙে না ফেলি। কোন কিছু ভেঙে ফেলা তো খুবই সহজ। গড়ে তোলা তত সহজ নয়। খুবই সম্ভব যে, অর্থনৈতিক ব্যবস্থার পরিবর্তন সাধন করতে গিয়ে আমরা ধ্বংসে এসে যেতে পারে। যে উৎপাদন আমাদের লক্ষ্য তা বন্ধ হয়ে যেতে পারে। পরিশেষে, হয়ত খুব আস্তে আস্তে, একটা নতুন ব্যবস্থা আপনারা গড়ে তুলতে পারেন।" ২১

'আমাদের সামান্য যা আছে' বলতে নেহরু যা বুঝিয়েছিলেন তা হল বৃটিশের তৈরি ঔপনিবেশিক শোষণের পদ্ধতি। এটুকু ছাড়া বৃটিশ শিল্পপতি এবং ব্যবসায়ীদের সঙ্গে এই ব্যবস্থার আর কোন প্রত্যক্ষ সম্পর্ক ছিল না। বরং প্রত্যক্ষ সম্পর্ক ছিল তাদের ভারতীয় প্রতিপক্ষদের যাদের স্বার্থে এই শোষণ ব্যবস্থাকে অব্যাহত রেখে দেওয়া হয়েছিল। নেহরু অবশ্য আশার বাণী শুনিয়ে রেখেছিলেন যে, সুদূরে কোন এক ভবিষ্যতে এই ব্যবস্থার পরিবর্তন হতে পারে।

১৯৪৮ সালের ৭ এপ্রিল গণপরিষদের (আইন বিষয়ক) সভায় নেহরু সরকারের প্রথম শিল্পনীতি প্রস্তাব উপলক্ষে ভারতের পক্ষে কোন অর্থনৈতিক পদ্ধতি বেছে নেওয়া উচিত সেই প্রশ্ন আবার তুলে ধরেছিল। প্রস্তাবটি উত্থাপন করেছিলেন শিল্পমন্ত্রী শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়। নেহরু বলেছিলেন:

"গত ৭।৮ মাস যাবৎ যে সব ঘটনা ঘটেছে তাতে আমাদের সতর্ক হওয়া দরকার যাতে এমন কোন পদক্ষেপ গ্রহণ না করি যার দ্বারা বর্তমানে যে অর্থনৈতিক ব্যবস্থা প্রচলিত আছে তা খুব বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। যথেষ্ট ধ্বংস এবং ক্ষতি সাধিত হয়েছে এবং এই সভার সামনে আমি ঘোষণা করতে পারি যে, চারদিকে ধ্বংস এবং ক্ষতি ছড়িয়ে যাব এমন বাঁর আমি নই।" ২২

স্পষ্টভাবে এই বক্তব্যের ইঙ্গিত ছিল সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার প্রতি, যা বিপুল পরিমাণ জীবন ও সম্পত্তির ধ্বংসসাধন করে ভারত ও পাকিস্তানের কোটি কোটি মানুষকে দেশত্যাগ করতে বাধ্য করেছিল। কিন্তু নরহত্যা, সম্পত্তিহানি এবং সংখ্যালঘুদের দেশত্যাগ যত বিপুল পরিমাণেই হয়ে থাকুক না কেন, প্রচলিত অর্থনৈতিক পদ্ধতিতে তা বিন্দুমাত্র পরিবর্তন আনতে সমর্থ হয়নি। প্রশ্ন উঠেছিল যে সাম্রাজ্যবাদীরা উত্তরাধিকার হিসাবে যে অর্থনৈতিক পদ্ধতি আমাদের সমর্পণ করে গেছে তার পরিবর্তন করা দরকার কিনা, এবং যদি সে পরিবর্তন প্রয়োজন হয় তাহলে এখনি তার আরম্ভ করা উচিত কিনা।

না। নেহরু এই প্রশ্নে কাউকে সংশয়ের মধ্যে রাখলেন না। তখন তখনি কোন পরিবর্তন নয়। তার চেয়েও বেশী—অর্থনৈতিক ব্যবস্থার কোন পরিবর্তনকে তিনি 'ধ্বংসের' সঙ্গে সমীকরণ করলেন। ভারতীয় শিল্পপতিদের উচ্চতম প্রতিষ্ঠান ফেডারেশন অফ ইন্ডিয়ান চেম্বার অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রির দিল্লী অধিবেশনে অকপটেই তিনি ঘোষণা করলেন, 'আমি 'ইজম' চুলতে চাই' এবং আরো বললেন যে তিনি চান অভিজ্ঞতার পরিপ্রেক্ষিতে সমস্যা সমাধানে এগিয়ে যাওয়া। ২৩ এটা হল ১৯৪৯ সালের ৫ই মার্চের ঘটনা। তাঁর অভিজ্ঞতার নিরিখে সমস্যা সমাধানের পথে এগিয়ে যাওয়ার নীতি দেশকে কোথায় টেনে নামিয়েছে তা নেহরুজী জানতে পেরেছিলেন তাঁর মৃত্যুর চার মাস আগে তাঁর নিজের নিযুক্ত একটা কমিটির প্রতিবেদন থেকে। ২৪ যত বেশী সংখ্যক মানুষ দারিদ্র্যরেখার নীচে নেমে যাচ্ছে ততই উঁচুতলার ১০ শতাংশ লোকের জন্য একই পাঁচতারা জাতীয় সংস্কৃতির বিকাশ ঘটে চলেছে।

## সাদা চামড়ার বদলে কালো চামড়া

স্বাধীনতা সংগ্রামের আমলে আমাদের দেশনেতারা ব্রিটিশরাজত্বের নাম দিয়েছিলেন—গোরুর গাড়ির দেশে রোলস রয়েসের প্রশাসন। যে আই-সি-এস ছিল সাম্রাজ্যবাদী শোষণের এবং নিষ্পেষণের লৌহবর্ম, তার

সম্পর্কে' ১৯০৬ সালে নেহরু লিখেছিলেন :
"একটা বিষয়ে আমি নিশ্চিন্ত যে, যতদিন এই আই-সি-এসের মনোবৃত্তি আমাদের প্রশাসনকে এবং জনসেবা প্রতিষ্ঠানগুলিকে আচ্ছন্ন করে রাখবে ততদিন ভারতে কোন নতুন ব্যবস্থা গড়ে তোলা যাবে না। প্রভুত্বপরায়ণতার এই মনোবৃত্তি সাম্রাজ্যবাদের সহিতকারের দোসর যার সঙ্গে স্বাধীনতার সহাবস্থান অসম্ভব। এই মনোবৃত্তি হয় স্বাধীনতাকে পিষে মারবে না হলে নিজেই নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। মাত্র এক আঘাতের মাধ্যমে এই মনোবৃত্তি ঘায়েল হতে পারে এবং তা হল র‍্যাডিক্যাল ব্যবস্থা। কাজেই আমার কাছে আবশ্যিক পূর্বশর্ত হল যে, নবযুগের কাজে আমরা সহিতকারের কাজ আরম্ভ করার আগে আই সি এস এবং ঐ জাতীয় পদের অবসান করতেই হবে।" ২৫

কিন্তু যেই মাত্র ঠিক হল যে, এখন-ই ঔপনিবেশিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থার পরিবর্তন করা হচ্ছে না, কংগ্রেস নেতৃত্ব স্বাভাবিক ভাবে আই সি এস এবং ঐ জাতীয় পদগুলিকে বজায় রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল, কারণ ঐ ঔপনিবেশিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা পরিচালনার বিশেষ কর্মকুশলতা তাদের ছিল। নেহরুর জীবনীকার সর্বপল্লী গোপাল এর দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দিয়ে তাই চাপিয়েছেন বল্লভভাই প্যাটেল এবং মাউন্টব্যাটেনের ঘাড়ে। নেহরু এই দুজনের ষড়যন্ত্রের শিকার হয়ে এতে সম্মত হয়েছিলেন এমন ধারণা করা বিশ্বাসযোগ্যতাকে টেনে অসম্ভব রকম লম্বা করা মাত্র। গোপালের বই সমালোচনা প্রসঙ্গে কলকাতার সামাজিক অধ্যয়ন কেন্দ্রের পার্থ চট্টোপাধ্যায় লিখেছেন।
"আমার মতে আমলাতান্ত্রিক সিঁড়ির উচ্চতম ধাপে আই সি এসকে রেখে দেবার সিদ্ধান্ত। নেহরুর অধীনে যে রাষ্ট্রীয় কাঠামো গড়ে উঠেছিল তার মধ্যে এটাও একটা গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত। এটা হল ঔপনিবেশিক আমলাতন্ত্রের অবিচ্ছিন্ন ঐতিহ্য। এটা গড়ে উঠেছিল জটিল নিয়ম এবং পদ্ধতিকে কেন্দ্র করে গঠিত নিয়ন্ত্রণ নির্বাহী ক্ষমতার উপরে। স্বাধীন ভারতের শাসনপদ্ধতির উপর এই প্রশাসন সারা দেশের উপরে একটা কলঙ্কের নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা খাটাতে পেরেছিল। আমলাতন্ত্রের সর্বোচ্চ স্তর-ই শেষ পর্যন্ত সুশৃঙ্খলভাবে, পুনঃপুনঃ এবং অবিরত ভাবে শাসক শ্রেণীর সর্বভারতীয় উচ্চ স্তরগুলির স্বার্থ রক্ষা করে থাকে। আই-সি-এসকে বজায় রাখার সিদ্ধান্ত নেহরু সচেতন ভাবেই নিয়েছিলেন। গোপাল লিখেছেন "স্বাধীনতার আগে এই সব অফিসারদের সমালোচনার ব্যাপারে নেহরুর মত এত তীব্র আর কেউ ছিল না। কিন্তু সুযোগ যখন তাঁর হাতে এল তখন তিনি এদের তাড়াহুড়ো অবসর দেওয়ালেন না। 'তাদের রেখে দেওয়া হয়েছিল', এবং এটাই হল গোপালের প্রধান ব্যাখ্যা, 'একতরফা তাঁর মৌলিক মহানুভবতার সুযোগে'।...কিন্তু এর চেয়েও যুক্তিসঙ্গত ও আপাতিক ব্যাখ্যা হল, 'সম্ভবত স্বাধীনতা পরবর্তীকালে দেশের প্রশাসনকে সম্পূর্ণ ভেঙে পড়া থেকে বাঁচানোর জন্য আই সি এসের কোন বিকল্প ছিল না।' কিন্তু গোপাল এখানেই থামেননি। 'আই-সি-এসকে টিকিয়ে রাখার পরিণাম সুফলপ্রসূ হয়নি। এই সব অফিসারেরা প্রশিক্ষণ এবং মনোবৃত্তি দুই দিক থেকেই ছিল রক্ষণশীল। কালক্রমে এরাই নীতি নির্ধারণের ক্ষেত্র বেদখল করে বসল।' এর জন্য অবশ্য নেহরু দোষী ছিলেন না। কারণ 'প্যাটেলের মত নেহরু কখনো এই সব আই সি এস-দের মুরুব্বি ছিলেন না। এ ব্যাপারে তাঁরা যে কেবল প্যাটেলের (যিনি এদের ঐতিহ্যগত মনোভাবের সমর্থক ছিলেন) সমর্থন লাভ করেছিলেন তা নয়, বরং মাউন্টব্যাটেনেরও, যিনি মানসিকতার দিক থেকে নেহরুর কাছের হয়েও আদর্শগত ভাবে ছিলেন প্যাটেলের সগোত্র।' সত্য যে, নেহরুর প্রভাব সত্ত্বেও নিভিল সারভেন্টদের দাপট ক্রমাগত বেড়েই চলল। 'নেহরু এটা বুঝতে পেরে দুঃখ প্রকাশ করলেন কিন্তু তার প্রতিকারের ক্ষমতা তাঁর সামান্যই ছিল। ....ক্ষমতা হস্তান্তরের সময়ে প্রশাসনের এই অতি আমলাতান্ত্রিক পদ্ধতির পরিবর্তন করা হয়ত যেত কিন্তু যে প্রকারে এবং যে পরিস্থিতিতে সেই ক্ষমতাহস্তান্তর ঘটেছিল তার ফলে তা সম্ভব হয়নি। আজ এই পদ্ধতির মধ্যে শক্তির পরিচয় থাকুক বা নেই তবু তো এ টিকে রয়েছে আজ অবধি।' ২৬

স্বাধীন ভারতের প্রতিষ্ঠাকে দৃঢ়মূল করার উদ্দেশ্যে মাউন্টব্যাটেনকে গবর্নর জেনারেল রূপে রেখে দেওয়ার অনুচ্ছিন্নস্তান্ত হিসাবে আই সি-এসদের চাকরি বজায়

রাখা হয়েছিল। উই খেলার পর কড়িও গিলতে আমাদের জাতীয় নেতারা আপত্তি করবেন কেমন করে?

ল্যারি কলিন্স্ এবং এবং ডোমিনিক লাপিয়ের যারা মাউন্টব্যাটেনের কাগজপত্র, রোজনামচা দেখবার সুযোগ পেয়েছিলেন, লিখেছেন:

"জহরলাল নেহরু যা দিতে চাইলেন এত অসাধারণ যে কোন ইংরেজ কোন ভারতীয়ের কাছ থেকে তা পাওয়ার কথা ভাবতেও পারে না। ঔপনিবেশিকতার অবসানের ইতিহাসে এই ঘটনা অনন্য হয়ে থাকবে। ভাইসরয়ের যে পাঠকক্ষে অসংখ্য চিন্তাক্লিষ্ট রাত তারা দু জনে একত্রে কাটিয়েছেন সেইখানে বসে জহরলাল নেহরু অনুরোধ করলেন শেষ ভাইসরয়কে, যিনি ভারতীয় ব্রিটিশ শাসনতন্ত্রের শেষ অধিকারী, যে শাসন প্রতীকের বিরুদ্ধে ছিল সমগ্র ভারতের এতদিনকার সংগ্রাম—তাকে তিনি এমন একটা আসন গ্রহণ করতে অনুরোধ করলেন যার চেয়ে উচ্চাসন স্বাধীন ভারত কল্পনাও করতে পারত না—স্বাধীন ভারতের গভর্নর জেনারেলের আসন।[২৭]

কেবল যে মাউন্টব্যাটেন এবং তার আই সি এস চক্রের পদগুলি অব্যাহত রইল তা নয়, বৃটিশ প্রধান সেনাপতির পদটি পর্যন্ত অব্যাহত রইল। যে সব ব্রিটিশ অফিসার ব্রিটেনে ফিরে যেতে চাইল তাদের দরাজ হস্তে পেনশন মঞ্জুর করা হল। ১৯৪৮-এর জুন পর্যন্ত মাউন্টব্যাটেন ভারতের গভর্নর জেনারেল রূপে অবস্থান করে গেলেন। তিনি অবসর নিলেন, আমাদের নেতারা তাঁকে অবসর নিতে বললেন বলে নয়—স্বেচ্ছায়। আমাদের কিছু নেতাদের নিয়ে একটা মন্ত্রিমণ্ডলী গঠিত হওয়া এবং আগে যে সব উচ্চপদ ইংরেজ অফিসারদের অধিকারে ছিল সেখানে কিছু ভারতীয় বসা ছাড়া সবকিছুই আগের মতই চলতে থাকল, অর্থনৈতিক ব্যবস্থা সমেত। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী কার্যপ্রণালী এমন অনাবনীয় হয়ে রইল যে, সর্বপল্লী গোপালের অভিমতে, আই সি এস সম্প্রদায় ক্রমে ক্রমে নীতি নির্ধারণের ক্ষেত্রেও কতৃত্ব আরম্ভ করল।

ব্রিটিশ আমলের রীতিনীতি কত অবাধে চলে এসেছে তার প্রমাণ পাওয়া যায় হীরেন মুখার্জী বর্ণিত নিম্নোক্ত ঘটনা থেকে, যিনি ১৯৫২—১৯৭৭ পর্যন্ত লোকসভার সদস্য ছিলেন।

"প্রথম সংসদের প্রথম অধিবেশনের গোড়ার দিকে এক সকালে সংসদ সদস্যরা স্তম্ভিত হয়ে দেখলেন যে, সংসদ ভবনের উপরে ইউনিয়ন জ্যাক উড়ছে এবং প্রধানমন্ত্রী নেহরুর কাছে একমুহূর্ত কৈফিয়ত চাইলেন। মহান ব্যক্তিটি কিছু না জেনে আমতা আমতা করে সুন্দর ভঙ্গিতে ক্ষমা চেয়ে সভাকে জানালেন যে, খুব দুঃখের বিষয় যে, সংসদভবনের তত্ত্বাবধায়কের ভুলে এমনটি ঘটে গেছে কারণ অভ্যাসবশত তিনি আবহমান রীতি অনুসরণ করছেন এবং রীতি ড্যান উইংকেলের (রাজার জন্মদিন বা ঐ জাতীয় কোনো উপলক্ষের মত) ৫:৬ একাজ করে ফেলেছেন। ১৯৫০ সনের ২৬ জানুয়ারি থেকে এই প্রথার অবসান ঘটান হয়। মুহূর্তটি ক্ষুদ্র হলেও তার বিষণ্ণতা কম ছিল না এবং যত শীঘ্র তাকে হেসে উড়িয়ে দেওয়া হোক না কেন, ঘটনাটি আমাদের রাজনৈতিক জীবনের স্থায়ী বিশ্বাসের স্মারক হয়ে রইল।"[২৮]

এটা কি এমন তুচ্ছ ঘটনা যাকে হেসে উড়িয়ে দেওয়া যায়? নাকি এটা এমন ঘটনা যে সম্বন্ধে আমাদের সংসদ সদস্যদের চিন্তিত হওয়া উচিত ছিল যে, কোনখানে গোলমাল হয়েছে? এবং এমনটা গোলমাল হয়ে গেছে যে, যে তত্ত্বাবধায়ক সর্বদা মন্ত্রীদের এবং সংসদকর্তাদের সংস্পর্শে থাকেন তিনি ধরেই নিলেন যে, আগের মতই এখনো ইউনিয়ন জ্যাক উড়িয়ে যেতে হবে? আসল রোগের বীজ ছিল সেই ব্যবস্থার মধ্যে যাকে স্বাধীন ভারত জীইয়ে রাখল—সংসদ ভবনগুলির তত্ত্বাবধায়কের অযোগ্যতা, অজ্ঞতা বা কর্তব্যবোধের অভাবের মধ্যে নয়।

এক দিক থেকে দেখতে গেলে স্বাধীনতা নিঃসন্দেহে একটা পরিবর্তনের সূচনা করেছিল। গানার মি র্দাল লিখছেন:

"দারিদ্র্যক্লিষ্ট ভারতীয় জনগণের প্রতিতুলনায় জাতীয় রাজনৈতিক নেতারা সকলেই ছিলেন সুবিধাভোগী উচ্চবিত্ত সম্প্রদায়ভুক্ত। এই নতুন পদ দায়িত্ব এবং ক্ষমতা তাদের সুবিধাভোগের পরিমাণ দ্রুত বাড়িয়ে দিল। স্বাধীনতা সংগ্রামে যারা প্রভূত ব্যক্তিগত ত্যাগ ও

কৃতি স্বীকার করেছিলেন, আজ তারা তাদের পদোন্নতিকে জাতীয় বিপ্লবের প্রতীক রূপে গ্রহণ করলেন। সিভিল সার্ভিস, পুলিশ সার্ভিস এবং সামরিক প্রশাসনের উঁচুতলার পদগুলিতেও স্বাধীনতা ভারতীয় আমলাদের সামনে সিংহদ্বার খুলে দিল। কারণ পলায়মান ব্রিটিশ অফিসারেরা এই উঁচু পদগুলিই দখল করেছিলেন এতকাল।" ২১

'ভারতীয় শাসক সম্প্রদায়ের পরিশীলিত শ্রেণী সম্বন্ধে মিলিয়ান বলেছেন :

ভারতের শাসক সম্প্রদায় উচ্চতর শ্রেণীর এমন নির্বাচিত অংশ যারা তাদের রাজনৈতিক ক্ষমতা ব্যবহার করেন তাদের সুবিধাভোগী অবস্থানকে বজায় রাখার জন্য। প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাধিকারের মাধ্যমে নির্বাচিত সংসদসদস্য ও বিধানমণ্ডলীয় সদস্যদের অধিকাংশ এই সুবিধাভোগী শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। সাধারণ মানের তুলনায় বেশী বেতন এবং অনেক উন্নততর বাসভবনের পক্ষে ভোট দেওয়ার ব্যাপারে তারা খুবই তৎপর। রাজনৈতিক চাকরি ও অনুগ্রহ বিতরণ করে এবং দুর্নীতিমূলক কার্যকলাপের দ্বারা জনপ্রতিনিধির পদমর্যাদা ব্যবহার করে তারা আরো অনেক সুযোগ আদায় করে থাকে। স্বভাবতই রাজনীতিবিদেরা এমন সংস্কারমূলক আইন প্রণয়ন করতে চায় না যা উচ্চতর শ্রেণীর ক্ষমতা এবং প্রভাবকে কার্যকরভাবে খর্ব করতে পারে। প্রতিতুলনায় জনগণ অত্যন্ত দরিদ্র এবং দুঃস্থ এবং অসাধ্য জাতিতে এবং উপজাতিতে বিভক্ত। উচ্চতর শ্রেণীর কাছে ন্যায় বিচার দাবি করার শক্ত সংগঠন তাদের নেই। তারা তাদের নিজেদের ক্ষমতা যে স্পষ্টভাবে অনুভব করতে পারে এমন নয়। গরিব লোকেদের বিশ্বাস তাদের দুরবস্থা ঈশ্বরের বিধান।" ৩০

## ওয়াভেলের "পরিকল্পনা ও উন্নয়ন বিভাগ"

কংগ্রেসের জাতীয় পরিকল্পনা কমিটি যখন কাজ করে যাচ্ছিল এবং এর বিভিন্ন উপসমিতিগুলি যখন দেশের অর্থনীতির বিভিন্ন দিক সম্বন্ধে নানা প্রতিবেদন তৈরি ও প্রকাশ করছিল যে, কীভাবে দেশের অবস্থার পরিবর্তন ঘটান যায়, তখন ভারতীয় ব্যবসায় গগনের বৃহৎ তারকা ১৯৪৪ সালে একটা পরিকল্পনা হাজির করলেন যা টাটা-বিড়লা পরিকল্পনা বা বোম্বে পরিকল্পনা নামে পরিচিত লাভ করেছিল। তারকাদের নাম জে-আর-ডি টাটা, জি-ডি বিড়লা, আর্দেশির দালাল, লালা শ্রীরাম, পুরুষোত্তম ঠাকুরদাস, জন মাথাই, এ-ডি শ্রফ এবং কস্তুরভাই লালভাই। এদের মধ্যে ঠাকুরদাস, দালাল এবং শ্রীরাম ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের নাইট ছিলেন। বোম্বে প্ল্যানে পরিকল্পনা করা হয়েছিল ১৫বছরের মধ্যে তিনটি পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার মাধ্যমে দশ কোটি টাকা বিনিয়োগের।

বোম্বে প্ল্যান প্রকাশিত হওয়া মাত্র ভাইসরয় ওয়াভেল তাড়াহুড়ো ব্যবস্থা নিলেন। ১৯৪৪ সনের ১লা জুন তিনি 'পরিকল্পনা ও উন্নয়ন' নামে একটি নূতন বিভাগ খোলার এবং তার ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী হিসাবে স্যার আর্দেশির দালালকে নিয়োগের কথা ঘোষণা করলেন। তখনকার কেন্দ্রীয় মন্ত্রীদের ভাইসরয়ের একটি এক্সিকিউটিভ কাউন্সিলের সদস্য বলা হত। বহু বৎসর আই সি এসের চাকরি করার পর দালাল টাটা আয়রণ অ্যান্ড স্টীলের ভারপ্রাপ্ত পরিচালকের দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন। এক্সিকিউটিভ কাউন্সিলের সদস্যপদে নিয়োগকালে তিনি এই পদে কাজ করছিলেন। ১৯৪৪ সালের মার্চ মাসে যখন তিনি জানতে পেরেছিলেন যে, তিনি শীঘ্রই ভাইসরয়ের এক্সিকিউটিভ কাউন্সিলের সদস্য হিসাবে 'পরিকল্পনা ও উন্নয়ন' দপ্তরের ভার পেতে যাচ্ছেন তখন তিনি কলকাতায় একটা সাংবাদিক সম্মেলন ডাকলেন। সেখানে তাকে এই সমালোচনার সম্মুখীন হতে হল যে, বোম্বে প্ল্যানের দ্বারা ধনীরা আরো ধনী এবং গরিবেরা আরো গরিব হবে। এর উত্তরে তাঁর যে বক্তব্য তখন প্রকাশিত হয়েছিল তা হল :

"এই (বোম্বে) পরিকল্পনার প্রাথমিক উদ্দেশ্য হল খাদ্য, বস্ত্র, স্বাস্থ্যব্যবস্থা, বাসস্থান, শিক্ষা প্রভৃতির উন্নতির মাধ্যমে জীবনমানের উন্নয়ন সাধন।..... শিল্পপতিদের পক্ষে অনিয়ন্ত্রিত স্বাধীনতা অস্বীকার করে তিনি বলেছিলেন যে, এই পরিকল্পনায় অর্থনৈতিক জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে কঠিন নিয়ন্ত্রণের প্রয়োজন হবে, এমন কি তাতে দেশের স্বার্থে প্রয়োজন হলে ব্যক্তি স্বাধীনতার এবং ব্যক্তিক উদ্যোগের সাময়িক বিরতি পর্যন্ত ঘটতে পারে,

যদিও তারা কোন ত্যাগিবাদী বা একনায়কতন্ত্রী অর্থনীতির পক্ষে ওকালতি করছেন না। ৩১

এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি ভারতের বৃহৎ ব্যবসায় "অর্থনীতির প্রতিটি ক্ষেত্রে বলিষ্ঠ নিয়ন্ত্রণের পক্ষে" আহ্বান জানাচ্ছে। পরিকল্পনা ও উন্নয়ন দপ্তরের ভার নিয়ে দালাল ১৯৪৪ সালের মে-জুন সাংবাদিক সম্মেলনে যে বক্তব্য রাখেন তাতে দেখা যায়:

"সার আরদেশির বলেন যে, বিভিন্ন সরকারী বিভাগে এবং প্রাদেশিক সরকারগুলিতে যে সব বিবিধ পরিকল্পনা ও পুনর্গঠনের কাজকর্ম চলছে, তার সমন্বয় সাধন তাঁর এই নতুন বিভাগটির কাজ। ভারত সরকার বোম্বে পরিকল্পনার প্রধান উদ্দেশ্য অর্থাৎ জীবনমানের উন্নয়নসাধন গ্রহণ করেছে। সরকার তার নিজের পরিকল্পনা অনুযায়ী শিক্ষা, পরিবহন প্রভৃতি নানা দিকে অগ্রগতি আরম্ভ করেছে। অবশ্য বোম্বে প্ল্যানের সম্পূর্ণ সাফল্যের জন্য একটা জাতীয় সরকারের প্রয়োজন, কেননা, লোকের অভ্যাসকে শৃঙ্খলাবদ্ধ, সংযত এবং সংকুচিত করার দায়িত্ব জাতীয় সরকারই বহন করতে পারে। তাদের শুভেচ্ছা এবং সমর্থন পাওয়ার পরও অনেক প্রাথমিক কাজ করার আছে।" ৩২

## টাটা-বিড়লা প্ল্যান সম্পর্কে নেহরুর প্রশংসা

আগেই বলা হয়েছে যে ১৯৬৮-এর ফেব্রুয়ারিতে গণ পরিষদের (আইন) সভায় নেহরু কংগ্রেসের জাতীয় পরিকল্পনা কমিটির কাজকে বাতিল করে দিয়েছিলেন, কেননা, তারা কোন 'চূড়ান্ত প্রতিবেদন' দাখিল করতে পারেনি। বোম্বে প্ল্যান সম্পর্কে তাঁর বক্তব্য শোনা যাক। যুদ্ধকালীন ১০৪১ দিন বন্দিজীবন যাপন করার পর ১৯৪৫ এর ১৫ই জুন তিনি মুক্তি পান। ২০শে জুন বোম্বেতে একটা সাংবাদিক সম্মেলনে বোম্বেপ্ল্যান সম্পর্কে তিনি বলেন:

"আমেদনগরে বোম্বে প্ল্যানটা প্রথম যখন পড়ি তখন যেমন অনকূলভাবে অবাক হয়েছিলাম তেমনি পড়ে খুশিও হয়েছিলাম (কংগ্রেসের প্রবীণ নেতাদের অধিকাংশ আমেদনগরে দুর্গে ৪২···৪৫ সালে পর্যন্ত বন্দী ছিলেন)। এর কারণ এ নয় যে, এই প্ল্যানের সব কিছুই আমার ভাল লেগেছিল। আমার মনে হয়েছিল যে, কৃষি-সমস্যা এবং কটেনলক্ষ্যার উপরে এই প্ল্যানে যথেষ্ট গুরুত্ব দেওয়া হয়নি। প্রশ্ন যাই হোক না কেন, আমাদের সব কিছুকে ঘাটো করা আমাদের ভারতীয়দের একটা স্বভাব। ·····আমি এই দেখে আনন্দিত হয়েছিলাম যে, এই প্ল্যানে খুব অপেক্ষাকৃত স্বল্পকালে অনেক বড় বড় পরিবর্তনের ছবি তুলে ধরা হয়েছে। একটা প্ল্যানকে বিচার করা উচিত মানুষের জীবনমান এবং সমাজকে কতদিনে কতখানি উন্নত করতে পারবে তার নিরিখে। কিন্তু মৌলিক প্রশ্ন হল কোন বস্তুপক্ষ একে কাজে পরিণত করতে যাচ্ছে? সর্বশ্রেষ্ঠ প্ল্যানও যদি ঠিক লোকের হাতে পড়ে তাহলে তার দ্বারা দেশের অহিত হতে পারে। ৩৩

কংগ্রেসের জাতীয় স্লোগান সম্বন্ধে মিদাল বলেছেন:

"নেহরুর সমর্থন এবং কখনো তাঁর প্রেরণাকে কংগ্রেসের প্রগতিশীল অংশ তাদের উদ্যোক্তার প্রায়শই প্রস্তাবগুলি কংগ্রেসের দ্বারা গ্রহণ করাবার জন্য সুস্থির ভাবে কাজ করে চলেছিলেন।···এই বুদ্ধিজীবী পরিশীলিত শ্রেণীর লোকেরা তাদের প্রগতিবাদী প্রতিশ্রুতিতে কংগ্রেসের যে সম্মতি আদায় করেছিল, শিল্পপতি ও ব্যবসায়ীরা তাতে নিষ্প্রাণ ভাব দেখিয়েছিলেন, অংশত এই কারণে যে, তারা বিশ্বাস করতেন (এবং পরবর্তী ঘটনা এই বিশ্বাসের সত্যতা প্রমাণ করেছিল) যে, একটা ভাল প্রস্তাব গ্রহণ করা এবং তাকে কাজে রূপ দেওয়ার মধ্যে রয়েছে বিস্তর। কথায় চরমপন্থা এবং কাজে চরম রক্ষণশীলতার ভারতীয় রাজনৈতিক নকশা···স্বাধীনতার আগে থেকেই সুপ্রতিষ্ঠিত ছিল।" ৩৪

নেহরু বোম্বে প্ল্যানের দ্বারা মুগ্ধ হয়েছিলেন কারণ এতে নাকি অনেক 'বড় বড় পরিবর্তনের ছবি তুলে ধরা হয়েছিল'। কিন্তু ব্রিটিশের ফেলে যাওয়া সামাজিক অর্থনৈতিক কাঠামোর পরিবর্তন না করেই যে এইসব বিকাশ বা উন্নয়নের কল্পনা করা হয়েছে—এটা নেহরুর কোন পীড়া উৎপাদন করল না। কংগ্রেসের নিয়োজিত জাতীয় পরিকল্পনা কমিটি এমন একটা ছবি তুলে ধরেছিল যার দ্বারা এই কাঠামোকে এমন ভাবে পরিবর্তিত করা হবে যার দ্বারা শুধু যে জাতীয় সম্পদ

বৃদ্ধি হত তা নয়, বন্টনব্যবস্থা ও সুবিচারকে নিশ্চিত করত।

## ওয়াভেলের আমল থেকে পরিকল্পনা এবং শিল্পনীতি

আমেদাবাদের পালালের পরিচালনায় ভাইসরয়ের একজিকিউটিভ কাউন্সিল প্রবিলেজের 'পরিকল্পনা ও শিল্পনীতি' সম্পর্কে একটা দলিল তৈরি করে ফেলল যার মধ্যে সরকারী ও বেসরকারী নামে দুটো উদ্যোগক্ষেত্রের ব্যবস্থা হল। বোম্বে প্ল্যানের প্রতিচ্ছবি কাউন্সিলের এই নীতি ১৯৪৩ সালে বিঘোষিত হয়েছিল :

অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে এর একটি বক্তব্য হল : "শিল্পনীতির প্রাথমিক প্রশ্ন হল শিল্পোদ্যোগের ক্ষেত্রে রাষ্ট্র নিজে কতখানি কর্তৃত্ব নিজের হাতে রাখবে এবং উৎপাদনে অংশ গ্রহণ করবে। ভারতে সামরিক সরঞ্জাম, রেল-ওয়ে ইত্যাদি জনপ্রয়োজনের শিল্পোদ্যোগের প্রতিষ্ঠানগুলি প্রথম থেকেই রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্ব ও পরিচালনাধীন। এই ব্যবস্থা স্বভাবতই অব্যাহত থাকবে। তদুপরি সম্প্রতি সরকারী সিদ্ধান্ত হয়েছে যে, বৈদ্যুতিক শক্তির সামগ্রিক উৎপাদনের দায়িত্ব যতদূর সম্ভব রাষ্ট্রের হাতে থাকবে। এই সিদ্ধান্ত সরকারী ও বেসরকারী উদ্যোগের যে চিরা-চরিত নক্‌শা, তারই অন্তর্গত। সরকারী কর্তৃত্বে আগে থেকেই যে সব জনপ্রয়োজনের শিল্প আছে তা ছাড়া জাতীয় গুরুত্বসম্পন্ন মৌলিক কোন শিল্পকেও জাতীয়-করণ করা যেতে পারে যদি জাতীয় স্বার্থে তা আবশ্যিক পরিগণিত হয় এবং তার জন্য বেসরকারী মূল্যবন পাওয়া না যায়। সরকারী নীতি নির্ধারণের সুবিধার্থে মৌলিক শিল্পের অন্তর্গত বলা যায় বিভাল উৎপাদন শিল্প, মোটর যান, ট্রাকটর, ইস্পাত ও রঙ, লৌহ ও ইস্পাত, ভারোত্তলন ও ভারবহন যন্ত্র, পরিবহনযান, বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি, ক্ষুদ্র যন্ত্র, বৈদ্যুতিক রসায়ন এবং লৌহেতর ধাতু শিল্প। এমনও ধরে রাখা হয়েছে যে, সেই সব শিল্প সরকার নিয়ে নিতে পারে যেখানে লাভের ব্যাপারের চেয়ে জনস্বার্থের ব্যাপার বেশি গুরুত্বপূর্ণ এবং রাষ্ট্রের পক্ষে ঐ শিল্প অধিগ্রহণ করাও সুবিধাজনক। অতীতে এই বন্টনের ব্যাপার ঘটেছিল 'নূন শিল্পে'।

"আর সব শিল্প ছেড়ে দেওয়া হবে বেসরকারী উদ্যোগের হাতে। শ্রমিকদের ব্যাপারে আইনের প্রয়োগ ছাড়া কোন নিয়ন্ত্রণেরই হয়তো প্রয়োজন হবেনা সেই সব শিল্পের ক্ষেত্রে যেখানে সাধারণ চাহিদার যোগান দেওয়া হয় খোলা প্রতিযোগিতার ভিত্তিতে। আবার আধা এক-চেটিয়া ধরনের শিল্পের ক্ষেত্র বা যেখানে দুর্লভ প্রাকৃতিক সম্পদ নিয়ন্ত্রিত হয় সেখানে অবশ্যদৃষ্টে আরও কঠোর নিয়ন্ত্রণের প্রয়োজন হতে পারে।" ৩৫

১৯৪৮ সালে শিল্পনীতি নির্ধারণের ব্যাপারে প্রধানমন্ত্রী নেহরুর নেতৃত্বাধীন ভারত সরকার লর্ড ওয়াভেলের একজকিউটিভ কাউন্সিলের বিঘোষিত নীতি থেকে বাস্তব প্রজ্ঞাবে বিশেষ বিচ্যুত হননি। ১৯৪৮ সালের শিল্পনীতিকে স্থানচ্যুত করে আর একটা শিল্পনীতি ঘোষিত হয়েছিল ১৯৫৬ সালে। এই নীতি থেকেও একাধিকবার বিচ্যুতি ঘটেছে এবং প্রতিবারই তা হয়েছে বেসরকারী শিল্পপতিদের স্বার্থে।

প্ল্যানিং কমিশনের জন্ম থেকে যে ভাবলোক সির তার সঙ্গে জড়িত ছিলেন এবং বহু বছর তার সদস্যও ছিলেন, ১৯৪৮ সালের শিল্পনীতি সম্পর্কে কার্যত কী করা হয়েছিল, তার বিবরণ তার কাছ থেকে শোনা যাক : "শিল্পোৎপাদনে উৎসাহ দেওয়ার জন্য বেসরকারী শিল্পকে নানা রকম কর সম্পর্কিত উৎসাহ দেওয়া হয়েছিল। এর মধ্যে ছিল ব্যবসায়ে লাভের উপরে কর লাঘব, যা পরে একেবারেই বিলোপ করা হয়েছিল, মূলধনী মুনাফার উপর করের বিলোপ, নতুন শিল্পের ক্ষেত্রে কর থেকে অব্যাহতি এবং নতুন কারখানার ক্ষেত্রে ঢালাও করকাঠামো বাবদে করের ছাড়। ১৯৪৯ সালের প্রথম শিল্পনীতি সম্পর্কিত ঘোষণায় যে সব উদারনীতির ঘোষণা করা হয়েছিল তাদের সব কিছুকে বানচাল দেওয়া হল।" ৩৬

## লিয়াকত আলি খানের বাজেট ও কংগ্রেস

ভাবলোক সির তার বিবরণে যে করবৃদ্ধির উল্লেখ করেছিলেন, ১৯৪৭-৪৮ সালের দরুণ্ট কংগ্রেস-লীগ অন্তর্বর্তী সরকারের অর্থমন্ত্রী তার বাজেটে এই বৃদ্ধি ঘটিয়েছিলেন। তিনি এইসব নতুন কর বসিয়েছিলেন এবং যেখানে পুরনো কর

চালু ছিল তাকে এমন ভাবে বাড়ালেন যে, শিল্পপতি শ্রেণী এবং ব্যবসায়ী সম্প্রদায় দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের কালে যে বিপুল পরিমাণ কালো ও সাদা টাকার পাহাড় জমিয়েছিল, তাকে ছেঁকে তোলার ব্যবস্থা করলেন। কংগ্রেস নেতারা অভিযোগ করলেন যে, লিয়াকত আলি অমুসলিম ব্যবসায়ীদের জেরবার করার জন্য এই ফন্দী এঁটেছেন। কিন্তু মুসলিম শিল্পপতি বা ব্যবসায়ীরা কী করে এ জাল ছিঁড়ে বেরিয়ে যেতে পারত তার ব্যাখ্যা দেওয়ার প্রয়োজন কেউ বোধ করলেন না। লুকোনো কালো টাকা খুঁজে বার করার জন্য আরকর তদন্ত কমিশন বসানোর একটা আইনও তিনি পাশ করান।

কংগ্রেস লীগ অন্তর্বর্তী সরকারের যে মন্ত্রিসভায় ওয়াভেল সভাপতিত্ব করতেন তিনি তাঁর ১২ ফেব্রুয়ারি ১৯৪৭-এর রোজনামচায় লিখেছেন :

"লিয়াকত তাঁর বাজেট প্রস্তাব নিয়ে দেখা করতে এসেছিলেন। নতুন কর প্রস্তাবের নামে ব্যবসায়িক মুনাফা কর (যুদ্ধকালীন অতিরিক্ত মুনাফা করের শান্তিকালীন সংস্করণ) বাবদ আনুমানিক আদায় হবে ৫০ কোটি। কর্পোরেশন করে এক আনা করে বাড়লে আসবে ৪ কোটি; সুপার ট্যাক্সে সামান্য পরিবর্তন থেকে আসবে অতিরিক্ত ২½ কোটি; লভ্যাংশের উপর কর (অনর্জিত বেতনবৃদ্ধির সমান) থেকে আসবে আরো ৩½ কোটি টাকা।

"কর ফাঁকি ধরবার জন্য তিনি একটা উচ্চক্ষমতা সম্পন্ন কমিশনের প্রস্তাব দিয়েছেন।

"আমি ব্যবস্থা করেছি যে, বাজেট প্রস্তাব নিয়ে নেহরু জাথাইয়ের সঙ্গে আগামী সপ্তাহের সোড়ায় আলোচনা হবে।"৩৭

২৮ ফেব্রুয়ারি ১৯৪৭ দিনান্তে, যে দিন গণপরিষদের (আইন) সভায় উপস্থাপিত হয়েছিল, ওয়াভেল তাঁর রোজনামচায় লিখেছেন :

"...বাজেট প্রস্তাব শোনবার জন্য সকাল ১০-৩০-এ আমাদের মন্ত্রিসভার অধিবেশন হল। আলোচনা ভালই চলল। রাজাগোপাল আচারি একটু বকবক করছিলেন। এ ছাড়া কেউ বিশেষ কোন প্রশ্ন তোলেনি।"৩৮

৫ই মার্চ ওয়াভেল লিখছেন :

"মন্ত্রিমণ্ডলীর যে সভায় লিয়াকত তাঁর বাজেট প্রস্তাব ব্যাখ্যা করেছিলেন, তার কার্যবিবরণীর সঙ্গে বিগত প্রশাদ করে নেহরু, বল্লভভাই প্যাটেল এবং সি এইচ ভাবা কার্যবিবরণীর স্বতন্ত্র ভাষ্য পাঠিয়েছেন। বলিলে দেখা যায় প্রস্তাবগুলি 'অনুমোদিত' হয়েছিল।...এখন যখন তারা দেখছেন যে বাজেট তাদের বড় বড় ব্যবসায়ী ও শিল্পপতি বন্ধুদের প্রীতি অর্জন করেনি, কাজেই তারা পিছু হটবার চেষ্টা করছেন...।"৩৯

১৭ই মার্চ ওয়াভেল লিখছেন :

"তারপর এলেন প্যাটিল...। তার পর আমরা বাজেট সম্বন্ধে কথা বললাম। তিনি বাজেটের বিরুদ্ধে খুব গরম গরম কথা ব্যবহার করলেন। বলাই বাহুল্য বিড়লা এবং বৃহৎ পুঁজিপতিরা এতে চটেছে যাদের সঙ্গে পিন্স সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ। তাদের জাতে ঘা লেগেছে। এটা বদলানর জন্য তারা সর্বশক্তি প্রয়োগ করেছে। পি চান পুরো বাজেট নিয়ে আবার ক্যাবিনেটে আলোচনা হোক। আমি বললাম, সিলেক্ট কমিটির রিপোর্টের জন্য আমাদের অপেক্ষা করতে হবে।"৪০

লিয়াকত খানের বাজেট প্রস্তাব নিয়ে তৎকালীন সরকারে যে ঝড় উঠেছিল—এটা হল একজন বৃটিশ ভাইসরয় লিখিত তার বিবরণ। কংগ্রেস পক্ষের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা থেকে এই ঘটনার বিবরণ পাওয়া যায় কেবল আবুল কালাম আজাদের কাছ থেকে, যিনি ১৯৪৬ সালের ২৭শে ডিসেম্বর সরকারে যোগদান করেন। কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির সদস্যরূপে দলের উচ্চ নেতৃত্বের বিভিন্ন সদস্যের মনোভাবের সঙ্গে তিনি পরিচিত ছিলেন। মন্ত্রিমণ্ডলীর মুসলিম লীগের সদস্যরা বিশেষতঃ লিয়াকত আলি খানে কার্যপ্রণালী সম্পর্কে আজাদ অত্যন্ত সমালোচনা প্রবণ ছিলেন। তিনি লিখেছেন।

"তারা (লীগের সদস্যরা) সরকারে ছিলেন অথচ কাজ করেছেন তার বিরুদ্ধে। বস্তুত আমাদের প্রতিটি পদক্ষেপকে বানচাল করে দেওয়ার সুযোগ তাদের ছিল। অর্থবিভাগের সদস্যের ক্ষমতা মাত্রা ছাড়িয়ে যাচ্ছিল এবং পরবর্তী বছরের বাজেট যখন লিয়াকত আলি উপস্থাপিত করলেন, তখন আমরা নতুন করে হতবাক হয়ে গেলাম।"৪১

ওয়াভেল চারটি মন্ত্রিপদের নাম করেছিলেন সর্বাধিক গুরুত্ব ক্রমে—আভ্যন্তরীণ (অর্থাৎ পুলিশ), অর্থ,

দেশরক্ষা এবং বিদেশসম্পর্কিত ও কংগ্রেসকে যে কোন তিনটি বেছে চতুর্থটি মুসলিম লীগের জন্য রাখতে বলেন। কংগ্রেস মন্ত্রিমণ্ডলীতে একজন শিখকে মনোনীত করতে পারবে। তিনি হলেন বলদেব সিং এবং তাকে দিতে হল দেশরক্ষা। নেহরুর অবশ্য চাই পররাষ্ট্র বিভাগ। এবং প্যাটেল আভ্যন্তরীণ বিভাগ ছাড়া আর কিছু নেবেন না। কাজেই কংগ্রেসের কাছে সবচেয়ে কম গুরুত্বপূর্ণ পদ হল অর্থমন্ত্রীর, যার ভার পেলেন লিয়াকত আলি খান। যেহেতু প্রত্যেক বিভাগের ব্যয় অর্থবিভাগ কর্তৃক মঞ্জুর হওয়া চাই অতএব প্রত্যেকের ব্যাপারেই তাদের হাত থাকল।

লিয়াকত আলি এই অধিকারের পূর্ণ ব্যবহার করার ফলে কংগ্রেস মনোনীত মন্ত্রীদের ক্রোধ যে কোথায় গিয়ে পৌঁছাল তার ঠিকানা নেই। এইবার উৎক্ষোভে আজাদের বিরক্তি ভাষা পেয়েছে।

বাজেট প্রস্তাবের উপরে তিনি এই রকম লিখেছেন: "কংগ্রেসের বিঘোষিত নীতি ছিল যে অর্থনৈতিক অসাম্য দূর করে ধনবাদী সমাজকে ক্রমে ক্রমে সমাজতান্ত্রিক ধাঁচের সমাজে রূপান্তরিত করা হবে। কংগ্রেসের নির্বাচনী ইস্তাহারেও এই কথাই বলা হয়েছে। শিল্পপতিরা ও ব্যবসায়ীরা যুদ্ধের বছরগুলিতে যে মুনাফা কামিয়েছে তার সম্বন্ধে আমি এবং জহরলাল দুজনেই বিভিন্ন সময়ে বলেছি। এটা সকলেই জানে যে, এই মুনাফার একটা সিংহভাগ আয়কর এড়িয়ে মাটির তলায় চলে গেছে। এর অর্থ হল ভারত সরকারকে তার পাওনা কর থেকে বঞ্চিত করা হয়েছিল এবং আমরা চেয়েছিলাম যে, অনাদায়ী কর আদায়ের জন্য ভারত সরকারের কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া উচিত।"

"লিয়াকত আলি এমন একটা বাজেট তৈরী করলেন যা বাহ্যত কংগ্রেসের বিঘোষিত নীতি অনুযায়ী রচিত হলেও পরিণামে যা কংগ্রেসকে তার মতবাদের কাছে বে-ইজ্জত করবে। তিনি এটা করলেন কংগ্রেসের দুটো দাবিকেই অবাস্তবভাবে ঘুরিয়ে দিয়ে যার ফলে সমস্ত শিল্পপতি ও ব্যবসায়ীরা খুসে হয়ে যেত এবং বিদেশাগত-পাদন থেমে যেত। সঙ্গে সঙ্গে তিনি একটা তদন্ত কমিটি বসানোর প্রস্তাব করলেন যারা কর ফাঁকির অন্ত করে অনাদায়ী কর ঘরে বার করবে শিল্পপতি ও ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে।" ৪২

## কংগ্রেসের দাবি সম্বন্ধে আবুল কালাম আজাদ

কংগ্রেসের অভিমত ছিল যে, প্রস্তাবিত কর নির্ধারণ প্রথা শিল্পপতি ও ব্যবসায়ী সম্প্রদায়গুলিকে খুসে করবে। কিন্তু যে কালো টাকা এবং অতিরিক্ত মুনাফা যুদ্ধের পরেও উত্তরোত্তর বেড়েই চলেছে, তা ঘরে বার করলে এবং তাদের করের হার আগের চেয়ে সামান্য বাড়ালে শিল্প এবং ব্যবসায়ের 'স্থায়ী ক্ষতি' হবে এমন ধারণা করার কী কারণ কংগ্রেস নেতাদের ছিল, আজাদ সাহেব তার কোন ব্যাখ্যা দেওয়া প্রয়োজন বোধ করেননি। ঐ প্রস্তাবগুলি সম্বন্ধে আজাদের আরো বক্তব্য হল:

"আমরা সবাই চেয়েছিলাম যে, সম্পদের সমবণ্টন ক্রমেই বেড়ে চলবে এবং সমাজ কর-ফাঁকিবাজদের শাস্তি দিতে হবে। কাজেই নীতিগতভাবে আমরা লিয়াকত আলির প্রস্তাবের বিরোধী ছিলাম না। প্রস্তাব উত্থাপন কালে লিয়াকত আলি বলেছিলেন যে, তাঁর প্রস্তাবগুলি কংগ্রেস নেতাদের বিঘোষিত নীতির ভিত্তিতে রচিত। তিনি আরো স্বীকার করেন যে, জহরলাল যদি ঐ ধরনের উক্তি না করতেন তাহলে এই ধরণের প্রস্তাব হয়তো তাঁর মনেই আসত না। তিনি কোন বিস্তৃত বিবরণ দেননি বলে সাধারণভাবে নীতিগতভাবে আমরা একমত হয়েছিলাম। এই নীতিগত সম্মতি লাভ করে তিনি এমন সব বিশেষ বিধান তৈরি করলেন যা কেবল কঠোর নয়, উদ্দেশ্য সুপরিকল্পিতভাবে জাতির অর্থনীতির ক্ষতি সাধন। ৪৩

আজাদ যথাসাধ্য কংগ্রেসের মুখ রক্ষা করার চেষ্টা করেছেন, যদিও কাজটা তত সহজ নয়। কারণ মনে রাখতে হবে যে, এই দলের বিঘোষিত নীতি চিরদিন এদের আচরিত ধর্ম থেকে অনেক দূরে সরে গেছে। কিন্তু নিচের অংশে কংগ্রেসের কয়েকজন বড় নেতা সম্পর্কে তাঁর বক্তব্য তাৎপর্যপূর্ণ।

"লিয়াকত আলির প্রস্তাব শুনে আমাদের কোন কোন সহকর্মী বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেলেন। এদের কারো কারো সঙ্গে শিল্পপতিদের গোপনে সুবাতা ছিল।

দপ্তরের দায়িত্ব নিলেন। দাশাইকে তখন দেওয়া হয় বাণিজ্য ও সরবরাহ। দেশভাগের পর তিনি রেলওয়ে ও পরিবহন পেলেন এবং ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের আর এক নাইট সংযুক্তন চেট্টির সরকার থেকে কয়েকজনকে বিদায় গ্রহণের কথা আগেই বলা হয়েছে। দাশাই তাঁর কাছ থেকে অর্থ দপ্তর গ্রহণ করেন, কিন্তু ১৯৫৩ সালের মে মাসে পদত্যাগ করেন। তাঁর স্থান পূরণ করেন ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের আর এক নাইট সি ডি দেশমুখ। বোম্বাই শহরকে মহারাষ্ট্র থেকে পৃথক করার কেন্দ্রীয় প্রস্তাব নিয়ে নেহরুর সঙ্গে প্রকাশ্য বিরোধের পর ১৯৫৬ সালের জুলাই মাসে তিনি পদত্যাগ করেন। এঁদের ব্যক্তিগত সততা নিয়ে প্রশ্ন নয়, এই সব মন্ত্রীদের অধিকাংশই সন্দেহের ঊর্ধ্বে। প্রশ্ন তাঁরা যে নীতি অনুসরণ করতে পেরেছেন তাই নিয়ে। এঁদের কেউ কোনদিন কংগ্রেসে ছিলেন না অথবা কংগ্রেস ও নেহরু যে নীতির প্রচারক এঁরা তার সমর্থক বলেও পরিচিত ছিলেন না। অথচ এঁরাই নতুন ভারতের সমাজ-অর্থনীতির ভিত্তিভূমি রচনা করেন। দেশমুখের পরে আসেন টি টি কৃষ্ণমাচারী; একটি বহুজাতিক সংস্থার সঙ্গে যাঁর পরিবারের ব্যবসায়িক সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ। তামিলনাড়ু থেকে আগত তাঁর স্বদেশবাসী চেট্টির মত কৃষ্ণমাচারীকে মন্ত্রিসভা ত্যাগ করতে হয় ১৯৫৮ সালে মুন্দ্রাদের সংগে এক অবাঞ্ছিত আদান প্রদানের জন্য। মোরারজী দেশাই তাঁর কাছ থেকে দায়িত্ব গ্রহণ করে ১৯৬০ সাল পর্যন্ত ছিলেন যখন কৃষ্ণমাচারীকে আবার মন্ত্রিসভায় নিয়ে আসা হল অর্থমন্ত্রী রূপে। অর্থ মন্ত্রকে এই হল নেহরুর শেষ নিয়োগ।

অর্থ ছাড়া অর্থ সংক্রান্ত অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ দপ্তরে নেহরু যাদের পছন্দ করেন তার মধ্যে ১৯৪৬ সালের অক্টোবরে বাণিজ্য ও সরবরাহ দপ্তরে নিযুক্ত দাশাইয়ের কথা আমরা আগে বলেছি। ১৯৪৮ সালে শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়কে এই দপ্তরে আনা হয়। কিছু দিনের জন্য তাঁরা বাণিজ্য দপ্তরে ছিলেন। শ্যামাপ্রসাদকে বাদ দিলে এঁরা সকলেই ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অথবা বৃহৎ ব্যবসায়ের অনুগত ভৃত্য নিযুক্ত ছিলেন।

## উত্তরাধিকার

নেহরুর প্রধানমন্ত্রিত্বে ভারত সরকার ১৯৬৪ সালে ব্রিটিশ ভাইসরয় কর্তৃক সৃষ্ট পরিকল্পনা ও উন্নয়ন দপ্তর হাতে পান এবং তার নতুন আকর্ষণীয় নাম দেন পরিকল্পনা কমিশন। যেহেতু নেহরু মনে করতেন সাম্রাজ্যবাদীদের সৃষ্ট ঢোল অর্থনৈতিক ব্যবস্থা পরিবর্তনের মধ্যে দিয়ে শুরু করলে তা 'ধ্বংসে করার' সমতুল্য তাই সরকার ঐ কাঠামোর ওপরই নির্মাণ শুরু করলেন। ১৯৪৩ সালে ভাইসরয়ের নির্বেশনায় আন্তর্দেশিয় দালাল যে শিল্পনীতি গঠন করেছিলেন সরকার সর্বপ্রথমে সেই নীতির উত্তরাধিকার হন এবং এর ভিত্তিতেই কাজ শুরু করেন, বাস্তবে যা টাটা-বিড়লা পরিকল্পনার ভিত্তি। অবশ্য এসে নেহরু এই শিল্পনীতি কার্যকর করার জন্য উপযুক্ত লোকদের পছন্দ করেন।

১৯৪৪ সালে তারা যখন তাদের পরিকল্পনা করছে তখন কি বৃহৎ শিল্পপতিরা স্বপ্নেও ভেবেছিলেন নেহরুর নেতৃত্বে কংগ্রেসের আমলে দেশের অর্থনীতি এই চেহারা ও চরিত্র নেবে এবং ব্যবসায়ীরা এত বেশি অর্থনৈতিক ক্ষমতা এবং তথাকথিত রাজনৈতিক পৃষ্ঠপোষকতা পাবে? সম্ভবত তারা ভাবতে পেরেছিল। যাহোক ১৯৫৩ সালের মধ্যেই তাদের সমস্ত সন্দেহ ও ভয় দূর হয়েছিল। এই বছরের মধ্যেই তারা হৃদয়ঙ্গম করতে পেরেছিল কংগ্রেস দেশের সামনে যে সমাজ-অর্থনৈতিক লক্ষ্য রাখছে। তাই নেহরু বলেন যে তিনি সুখী যে তারাও 'সমাজতান্ত্রিক ধাঁচের সমাজের' পক্ষে, যা তাঁর ব্যাখ্যায় 'এক লগ্নসমষ্টি, এক কথায় যার অর্থ, সমাজতন্ত্র।' আমাদের শিল্পপতি ও ব্যবসায়ী সমাজের সঙ্গে কংগ্রেস নেতৃত্বের সম্পর্ক চিরকালই গভীর। পরিকল্পনা শুরু হবার পর সম্পর্ক গভীরতর হয়।

অর্থনীতির ওপর বিভিন্ন ধরনের নিয়ন্ত্রণ পর্যায়ক্রমে এবং ক্রমিত গতিতে সমাজতন্ত্রে পৌঁছবার উপায় বলে আমাদের শাসকরা প্রচার করেন। অর্থনীতির বিভিন্ন ক্ষেত্রে নিয়ন্ত্রণ স্বাধীন ভারতে নতুন কিছু নয়। ব্রিটিশরা তাদের রাজত্বকালে, এমন কি শিল্পোন্নয়নের ক্ষেত্রেও বিভিন্ন ধরনের নিয়ন্ত্রণ জারী করেছিলেন। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় এই নিয়ন্ত্রণ আরো শক্ত করা হয় এবং সংখ্যাও বাড়ানো হয়। বর্তমান

অন্যদের বাড়না লিয়াকতের প্রস্তাবগুলি রাজনৈতিক অভিসন্ধি-প্রসূত, অর্থনৈতিক বিচারপূর্ণ নয়। প্যাটেল এবং সি রাজাগোপাল আচারি বিশেষত এই বাজেটের ঘোরতর বিরোধী ছিলেন। কারণ তাদের বাড়না লিয়াকত আলির আসল উদ্দেশ্য শিল্পপতি ও ব্যবসায়ীদের হয়রান করা—দেশের স্বার্থরক্ষা নয়। তাদের বারণা ব্যবসায়ীদের অনিষ্ট সাধনই লিয়াকতের আসল অভিসন্ধি, যে ব্যবসায়ীদের অধিকাংশ হিন্দু। রাজাজী প্রকাশ্যে বললেন যে তিনি লিয়াকতের বিরুদ্ধে এবং ইঙ্গিত করলেন ঐ প্রস্তাবগুলির ভিত্তি হল সাম্প্রদায়িক বিচার। আমি সহকর্মীদের কাছে উল্লেখ করলাম যে, প্রস্তাবগুলি কংগ্রেসের বিঘোষিত নীতির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। অতএব এগুলির বিরোধিতা না করে আমাদের উচিত গুণানুযায়ী তাদের বিচার করে যেগুলির যতখানি আমাদের নীতির সঙ্গে সমঞ্জস্যপূর্ণ তত্টুকু তাদের সমর্থন করা। ৪৪

প্রাসাদ থেকলেন কংগ্রেস নেতৃত্বে তিনি সম্পূর্ণ একা। এমন কি নেহরুও তার পাশে নেই। নেহরু কেন্দ্রের কংগ্রেসী মন্ত্রীদের সঙ্গে রয়েছেন, যারা লিয়াকত আলি খানের কর-প্রস্তাবের বিরোধিতা করে ভাইসরয়ের কাছে নোট পাঠিয়েছেন। ভাইসরয়ের মাধ্যমে তারা লিয়াকত আলি খানকে দিয়ে সামান্য পরিবর্তনে সফল হন। কংগ্রেস পুরো ক্ষমতায় থাকলে এই কর হয় একেবারে তুলে নেওয়া হত আর না হয় ছাটাই করা হত।

## সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় নেহরু যাঁদের সহযোগী করেন

১৯৪৮ সালের আগস্ট মাসে গণ পরিষদে (আইন) লিয়াকত আলি খানের বাজেট চাপা পড়ে গেল। তার বাজেট বক্তৃতায় তিনি প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন ফাঁকি দেওয়া কর ওসুল করে উদ্ধার করার জন্য একটি কমিশন গঠনের এবং সরকার যাতে এই কমিশন গঠন করতে পারেন তার জন্য ১৯৪৭ সালের এপ্রিলে একটি আইন পাস করেন। কমিশন গঠনের প্রাথমিক কাজ তিনি সম্পূর্ণ করার আগেই উপ-মহাদেশ ভাগ হয়ে গেল। স্বাধীন ভারতের সরকার আইনটিকে বরবাদ করতে পারল না কারণ সেক্ষেত্রে জনসাধারণের কাছে তাদের তাৎক্ষণিক নষ্ট হবে। যতদিন সম্ভব দেরী করে সরকার ১৯৪৭ সালের ডিসেম্বরে এক আয়কর তদন্ত কমিশন গঠন করলেন। আইনের প্রয়োজন অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট দপ্তর-গুলি কমিশনের কাছে কয়েকজন ব্যবসায়ীর নাম তাঁদের ব্যবসা সম্পর্কে তদন্তের জন্য পাঠিয়ে দিলেন।

স্বাধীন ভারতে নেহরুর প্রথম মন্ত্রিসভায় ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের একজন নাইট আর কে সন্মুখম চেট্টি ছিলেন অর্থমন্ত্রী। তিনি চুপি চুপি তদন্তের আওতা থেকে কয়েকজন ব্যবসায়ীর নাম তুলে নিলেন। খবরটি জানা-জানি হয়ে গেল এবং লোকসভায় ও তার বাইরে তুমুল হৈ চৈ পড়ে গেল। তাঁকে পদত্যাগ করতে হল। পদত্যাগের সময় তাঁর কাজের জন্য তিনি বিভাগীয় উপদেষ্টাদের ওপর দোষারোপ করতে চাইলেন। তার পদত্যাগের একদিন পরে ৪৮ সালের ১৭ই আগস্ট তিনি লোকসভায় একটি বিবৃতি দেন। এই বিবৃতিতে তিনি আগের বিবৃতি প্রত্যাহার করে নেন যে, অফিসারদের কথা অনুযায়ী তিনি কাজ করেছিলেন এবং "কিছারে ভ্রান্তি" হয়েছিল বলে স্বীকার করেন। পদত্যাগ সম্পর্কে বলতে গিয়ে নেহরু চেট্টিকে অপরাধ থেকে মুক্তি দিলেন এবং এই বলে তার গুণগান করলেন যে, "অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ" পদে তাঁর কর্মক্ষমতা ও কঠিন পরিশ্রম দ্বারা সরকার লাভবান হয়েছেন" কিন্তু একথাও বলেন চেট্টি 'কিছার গুরুত্বপূর্ণ' ত্রুটির অপ-রাধে অপরাধী, এবং এই ধরণের ত্রুটি উপেক্ষা করার মত ব্যাপার নয়। ৪৫

অর্থনীতি পুনর্গঠনের যে কোন পরিকল্পনায় অর্থমন্ত্রীর গুরুত্ব সবচেয়ে বেশি। অন্যান্য মন্ত্রীদের অর্থের জন্য অর্থমন্ত্রীর ওপর নির্ভরশীল থাকতে হয়। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের এক ভারতীয় নাইট টাটা-বিড়লা পরিকল্পনার আরদেশির দালালকে ওয়াভেল তার এক্সিকিউটিভ কাউন্সিলে পরিকল্পনা ও উন্নয়নের সদস্য করেছিলেন। ১৯৪৬ সালের সেপ্টেম্বরে মুসলিম লীগকে বাদ দিয়ে নেহরু তার প্রথম অন্তর্বর্তী মন্ত্রিসভা গঠন করেন। অর্থ দপ্তরের জন্য তিনি জন মাথাইকে মনোনীত করেন যিনি টাটার ম্যানেজিং ডাইরেক্টর ছিলেন এবং আরদেশির দালালের মত যিনি টাটা-বিড়লা পরিকল্পনার জনক। ১৯৪৬ সালের অক্টোবরে মুসলিম লীগ যখন অন্তর্বর্তী সরকারে যোগদান করল, লিয়াকত আলি অর্থ-

ব্যবস্থার নিয়ন্ত্রণের ফলে তাদের জন্য যে সুবিধার সৃষ্টি হয় সে সম্পর্কে ব্যবসায়ী সমাজ অবহিত হন এবং আরো নিয়ন্ত্রণ চান, যেহেতু কংগ্রেস ও বিশেষ উৎসাহ সহকারে নেহরু অনেক আগে থেকেই নিয়ন্ত্রণের সুযোগগুলি প্রচার করতে থাকেন।

স্বাধীন ভারত ব্রিটিশের কাছ থেকে তথাকথিত কালোবাজার ও কালোটাকার উত্তরাধিকার লাভ করে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় কালোবাজারী অর্থনীতির অঙ্গে পরিণত হয়। যুদ্ধের টানাপোড়েনে সাম্রাজ্যবাদী শাসকরা একে উপেক্ষা করে, সমস্ত নিয়ন্ত্রণ সত্ত্বেও স্বাধীন ভারতে কালোটাকার মত আর কিছু এমন দ্রুতগতিতে বাড়েনি, বিনা বাধায় যা করা হচ্ছে। ৪৫

প্রথম অন্তর্বর্তী সরকার থেকে শুরু করে দ্বিতীয় পরিকল্পনার প্রারম্ভ পর্যন্ত নেহরু যে সরকারগুলি গঠন করেন তা "জাতীয় সরকারের" ছাঁচ নেয়, ১৯৪৬ সাল থেকে টাটা-বিড়লা পরিকল্পনাকারীরা যা চেয়ে আসছে। এইসব "জাতীয় সরকারে" কমিউনিস্ট ও সোশ্যালিস্টদের কোন স্থান ছিল না। স্বাধীনতা আসার আগেই কমিউনিস্টদের কংগ্রেস থেকে বিতাড়িত করা হয়। হিটলার সোভিয়েত ইউনিয়ন আক্রমণ করার পর ভারতে ব্রিটিশের যুদ্ধ প্রচেষ্টাকে মদত দিয়ে তারা যে বোকামি করেছিল কংগ্রেস নেতৃত্ব তাদের বাহিষ্কারে সেই সুযোগকে কাজে লাগিয়েছিলেন। সোশ্যালিস্টদের বিরুদ্ধে এই ধরণের কোন অজুহাত দেখানো যায়নি, এবং যখন অধিকাংশ প্রবীণ কংগ্রেস নেতা জেলের নিরাপদ আশ্রয়ে ছিলেন, তখন এঁরা শুধু নেতৃত্বই দেননি, ভারত ছাড় আন্দোলনে সর্বাপেক্ষা সংকল্পবদ্ধ ও উৎসর্গীকৃতপ্রাণ স্বেচ্ছাসেবক ছিলেন। কিন্তু জাতীয় আন্দোলনে এই বিরাট অবদান জয়প্রকাশ নারায়ণের নেতৃত্বাধীন সোশ্যালিস্টদের কোন কাজে এল না। ১৯৪৮ সালে তাদেরও কংগ্রেস থেকে বিদায় করা হল। কাদের জন্য কংগ্রেস এবং কেন্দ্রে ও রাজ্যে তাদের সরকারকে নিরাপদ করা হল?

নীচের অংশ থেকে সম্ভবত তার উত্তর পাওয়া যাবে যা লিখেছিলেন ১৯৬০ সালে য়োনাল্ড সেগল নামে এক বিদেশি, যিনি দক্ষিণ আফ্রিকায় বর্ণবৈষম্যের বিরুদ্ধে লড়তে গিয়ে বর্ণবিদ্বেষীদের হাতে লাঞ্ছিত হন: "কংগ্রেস সরকার ব্যবসায়ী সমাজকে সেই অস্ত্র ফিরেছে যা দিয়ে তারা কংগ্রেসকে মুক্তিপণ হিসাবে আটক রেখেছে।

ব্যবসায়ী সমাজ যত ধনী ও প্রতিপত্তিশালী হচ্ছে, ততই আরো ধনী ও প্রতিপত্তিশালী হতে চাইছে। স্বভাবতই এইভাবে কংগ্রেসের মূল চরিত্রই পরিবর্তিত হয়ে গেছে। দলনেতাদের হাতে নীতিগত সংকল্প ক্রমশই অধঃপতিত হচ্ছে, রাজনৈতিক উদ্যোগীরা যারা ব্যবসায়ী সমাজের কাছ থেকে টাকা পয়সা সংগ্রহ করে, দানের সঙ্গে আকাঙ্ক্ষাও জানিয়ে দেয় এবং লড়াইয়ের কেন্দ্র সংগঠন করে। এরাই কংগ্রেসের রাজনৈতিক যন্ত্র চালনা করে এবং এই যন্ত্রই নির্বাচনী জয় এনে দেয়। প্রথম পার্টিবস সর্দার প্যাটেল বিরাট প্রশাসক ছিলেন, ব্যবসায়িক স্বার্থরক্ষার্থে যিনি ক্ষমতার প্রয়োগ করেছিলেন কিন্তু যে ধরণের ভারত গড়তে চান তার জন্য যেই প্রয়োজন বুঝলেন তখন দেখা গেল তিনি তাকে উপেক্ষা, এমন কি অস্বীকার করলেন। তাঁর উত্তরাধিকারীরা অবশ্য প্রধানত ক্ষুদ্র ব্যক্তি, যাঁদের অভিষ্ট নীতি নয়, ক্ষমতা এবং যারা নিজেদের ও নিজেদের দলকে সম্পদের দাস করেছেন। ক্রমে ক্রমে ব্যবসায়ীরাই আজকের ভারতের আসল শাসক বলে পরিগণিত হবার দাবী করতে পারেন। এঁদের পৃষ্ঠপোষকতার ওপর পেশাদার শ্রেণী—ডাক্তার, আইনজীবী ইঞ্জিনীয়ার যারা স্বাধীনতা সংগ্রামে প্রচণ্ড প্রভাব বিস্তার করেছিলেন এখন নির্ভরশীল। ৪৬

সতেরো বছর প্রধানমন্ত্রিত্বের পর এবং চোদ্দ বছর কংগ্রেস ও ভারত সরকারের অপ্রতিদ্বন্দ্বী নেতৃত্বের পর নেহরুর মৃত্যুর সময় কংগ্রেসের এই চরিত্রায়ণ। সেগল যে অর্থে "রাজনৈতিক উপরওলারা" শব্দ ব্যবহার করেছেন সে অর্থে তারা সমস্ত ক্ষমতা হারিয়েছেন এবং জায়গা ছেড়ে দিয়েছেন একটিমাত্র ব্যক্তি—নেহরুর কন্যা ইন্দিরা গান্ধীকে, যিনি তাঁর পুত্রের সাহায্যে সমস্ত ক্ষমতা নিজের হাতে কেন্দ্রীভূত করেছেন।

নেহরু ১৯৩৬ সালে লিখেছেন: "একথা নিশ্চিত মনে হয় যে সুবিধাভোগী শ্রেণী তাদের সুবিধাজনক অবস্থা বজায় রাখার জন্য বলপ্রয়োগে দ্বিধা করবে না।" ৪৭

সুবিধাভোগী শ্রেণী—শিল্পপতি, ব্যবসায়ী ও বৃহৎ চাষীরা ১৯০৬ সালে বা ১৯৪৭ সালে অথবা নেহেরুর মৃত্যুর সময়ের থেকে অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক দিক থেকে অনেক বেশি শক্তিশালী। আমাদের সমাজ-অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে শান্তিপূর্ণ উপায়ে কোন আমূল পরিবর্তন তারা আসতে দেবে না। তারা সমস্ত শক্তি দিয়ে এই ধরণের পরিবর্তন আনার চেষ্টাকে প্রতিরোধ করবে।

সারা দেশে ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে এবং শ্রেণীতে শ্রেণীতে তীব্র বিভেদ ছাড়াও রাজ্যে রাজ্যে ও অঞ্চলে অঞ্চলে বিভেদও বিপজ্জনক পর্যায়ে গেছে এবং এই বহু-জাতিক, বহুভাষিক দেশ প্রচণ্ড সঙ্কটের সম্মুখীন। সুবিধাভোগী রাজ্যগুলি সুবিধাভোগী শ্রেণীগুলির মতই লক্ষ্য রাখবে সরকারের নীতি ও কার্যক্রম যাতে পরিবর্তিত না হয়, অথবা এমন কি সামান্য হেরফেরও।

---

১। অল ইণ্ডিয়া কংগ্রেস কমিটি, হ্যাণ্ডবুক ফর কংগ্রেসমেন, নিউ দিল্লী, পৃঃ ১০৬।

২। গভর্নমেণ্ট অব ইণ্ডিয়া, পাবলিকেশন্স ডিভিসন। জহরলাল নেহরুজ স্পীচেস, ৩য় খণ্ড ১৯৭০। প্রস্তাবের পাঠের জন্য অল ইণ্ডিয়া কংগ্রেস কমিটি (অর্গানাইজেশন), রেজলিউশন অন ইকনমিক পলিসি, প্রোগ্রাম অ্যাণ্ড অ্যালায়েড ম্যাটার্স (১৯২৪—৬৯) পৃঃ ৮৬—৮৯।

৩। অল ইণ্ডিয়া ম্যানুফ্যাকচারার্স অর্গানাইজেশন, নিউ দিল্লীতে প্রদত্ত ভাষণ। বক্তৃতার পাঠের জন্য জহরলাল নেহরুজ স্পীচেস, ৩য় খণ্ড, পৃঃ ৮৫।

৪। ঐ, পৃঃ ৫২। প্রধানমন্ত্রীরূপে নেহরু কখনও সমাজতন্ত্র কি ব্যাখ্যা করেন নি। কিন্তু তিনি ও কংগ্রেস সমাজতন্ত্রের লক্ষ্যকে সামনে রেখে কাজ করে যাচ্ছে এবথা উচ্চারণে কখনও বিরত হননি। রাজনীতিকরা, শুধু ভারতে নয়, প্রায় সর্বত্র দেখেন তারা যা প্রচার করেন সে সম্পর্কে অস্পষ্ট থাকলে জনসাধারণকে নিজেদের পক্ষে অনুগামী করা সহজ হয়। তুলনীয়ঃ "একজন (ইউ এস) সেনেটর, পণ্ডিতানা, ক্ষমতাশালী এবং রাজনৈতিক ব্যবস্থাপনায় অদ্ভুত পারদর্শী চতুর নেতা আমায় বলেছিলেন যে, আমেরিকানবাদ এ বছর প্রচারের ভিত্তি হবে। আমি যখন প্রশ্ন করি আমেরিকানবাদ মানে কি তিনি বলেন তিনি জানেন না, কিন্তু এটা বেশ ভাল শব্দ যা দিয়ে নির্বাচনে জেতা যাবে।" (স্টুয়ার্ট চেজ, দি টিরানি অব ওয়ার্ডস, অরেনষ্ট গোয়ারের দি কম্পিলট ফ্রিন ওয়ার্ডস গ্রন্থে উদ্ধৃত, দেদারব্যাক, লণ্ডন, ১৯৬০, পৃঃ ৭১।

৫। জহরলাল নেহরুর স্পীচেস, ১ম খণ্ড।

৬। হিটলার সপ্তম সদস্যরূপে জার্মাণ ওয়ার্কার্স পার্টিতে যোগদান করেন, নেতৃত্ব গ্রহণ করেন এবং "ন্যাশনাল সোস্যালিস্ট" শব্দ যোগ করেন একে ন্যাশনাল সোস্যালিস্ট (নাজি) জার্মাণ ওয়ার্কার্স পার্টি করার জন্য।

৭। দি মুসলমান, ইসলামাবাদ, ২৭শে সেপ্টেম্বর, ১৯৮২।

৮। ইণ্ডিয়ান কেমিক্যাল ম্যানুফ্যাকচারার্স এসোসিয়েশনে, নিউ দিল্লীতে প্রদত্ত ভাষণ, ১৩ নভেম্বর, ১৯৫৩, জহরলাল নেহরুজ স্পীচেস, ২য় খণ্ড, পৃঃ ১৭।

৯। "পাবলিক সেক্টর। হোপ অ্যাণ্ড ডেসপেয়ার," ব্রিজ, বোম্বাই, জানুয়ারী ২৬, ১৯৭৪।

১০। শ্রীমান ডাঙ্গা, ৩য় খণ্ড, পৃঃ ২১০৫

১১। জহরলাল নেহরুজ স্পীচেস, ১ম খণ্ড, পৃঃ ১২৫।

১২। ন্যাশনাল হেরল্ডের রিপোর্ট, দিল্লী, ৩১শে জুলাই, ১৯৮২।

১৩। ব্রিজ, ২৬শে জানুয়ারী, ১৯৭৪।

১৪। ভারত সরকারের ইকনমিক সার্ভে ১৯৮১-৮২, টেবল ৭.১, পৃঃ ১০৮।

১৫। টি ম্যাথু (বিহার স্কুল অব ইকনমিকসের), ইকনমিক অবজেকটিভস অ্যাণ্ড ট্যাক্স-এক্সপেণ্ডিচার পলিসিজ অব ইণ্ডিয়া ১৯৫০—৭০, ইকনমিক অ্যাণ্ড সাম্রেস্টিক্যাল রিসার্চ ফাউণ্ডেশন, নিউ দিল্লী, ১৯৭৪, পৃঃ ৭-৮।

১৬। ঐ, পৃঃ ৩১-৩২।

১৭। ঐ গ্রন্থের টেবল ১, পৃঃ ৬-এ প্রদত্ত সংখ্যা থেকে তৈরি করা।

১৮। ঐ, পৃঃ ৩৩-৩৪।

১৯। ভারত সরকারের ইণ্ডিয়ান লেবারবুক, ১৯৭৮, পৃঃ ৩২।

২০। জহরলাল নেহরুজ স্পীচেস, ১ম খন্ড, পৃঃ ১০৭-এ প্রস্তাবের পাঠ দেওয়া আছে।

২১। ঐ, পৃঃ ১৩৯-১০।

২২। ঐ, পৃঃ ১২০।

২৩। ঐ, পৃঃ ১৪১।

২৪। প্ল্যানিং কমিশন, রিপোর্ট অব দি কমিটি অব ডিস্ট্রিবিউশন অব ইনকাম অ্যান্ড লেভেলস অব লিভিং, ১ম খন্ড, "আয় ও সম্পদ বন্টন এবং অর্থনৈতিক ক্ষমতার কেন্দ্রীকরণ"। কমিটি মহলানবীস কমিটি নামেই অধিক পরিচিত।

২৫। জহরলাল নেহরু, অ্যান অটোবায়োগ্রাফী, লন্ডন, ১৯৩৬, পৃঃ ৪৪৫।

২৬। দি ইন্ডিয়ান হিস্টোরিক্যাল রিভিউ, ২য় খন্ড, নং ১-২ পত্রিকায় এস. গোপাল লিখিত জহরলাল নেহরুর এ বায়োগ্রাফী, ২য় খন্ড-র সমালোচনা।

২৭। ফ্রিডম অ্যাট মিডনাইট, পেঙ্গুইন্যাক, ১৯৮১, পৃঃ ১৮৩।

২৮। পেপার্স অব পার্লামেন্ট : রিপ্রেজেন্টেশন অ্যান্ড রিফ্লেকশন (১৯৫২—৭৭) দিল্লী, ১৯৭৮, পৃঃ ১৭।

২৯। বিপিনচন্দ্র ভাষ্য, ১ম খন্ড, পৃঃ ২৭৩।

৩০। ঐ ২য় খন্ড, পৃঃ ২৬৬-৬৭

৩১। কিসিংস কনটেম্পোরারী আরকাইভস, লন্ডন, ১৯৪৫, পৃঃ ৭০৮৩

৩২। ঐ, পৃঃ ৭০৮৩।

৩৩। সিলেক্টেড ওয়ার্কস অব জহরলাল নেহরু, ১৪ খন্ড, এস গোপাল সম্পাদিত, নিউ দিল্লী, ১৯৮১, পৃঃ ১১।

৩৪। বিপিনচন্দ্র ভাষ্য, ১ম খন্ড, পৃঃ ৬১।

৩৫। সিলেক্টেড ডকুমেন্টস অন দি হিস্ট্রী অব ইন্ডিয়া অ্যান্ড পাকিস্তান, ৪র্থ খন্ড : "দি ইভোলিউশন অব ইন্ডিয়া অ্যান্ড পাকিস্তান ১৮৫৮—১৯৪৭," সি এইচ ফিলিপস সম্পাদিত, লন্ডন, ১৯৬২, পৃঃ ৭০৩-০১।

৩৬। ইন্ডিয়ান ডেভেলপমেন্ট এক্সপিরিয়েন্স, দিল্লী ১৯৭৪, পৃঃ ১৪।

৩৭। ওয়াভেল, দি ভাইসরয়েজ জার্নাল, পেঙ্গুইন বুক সম্পাদিত, লন্ডন, ১৯৭৩, পৃঃ ৪১৯।

৩৮। ঐ পৃঃ ৪২৪।

৩৯। ঐ, পৃঃ ৪২৫।

৪০। ঐ, পৃঃ ৪২৯।

৪১। আবুল কালাম আজাদ, ইন্ডিয়া উইন্স ফ্রিডম, কলকাতা ১৯৫৯, পৃঃ ১৭৫।

৪২। ঐ, পৃঃ ১৭৫-৭৬।

আজাদ যে বলেছেন লিয়াকত আলী খান যখন তাঁর বাজেট তৈরি করেন (ফেব্রুয়ারী, ১৯৪৭) তার মধ্যে কংগ্রেস তার লক্ষ্য হিসেবে "সমাজতান্ত্রিক ধাঁচ" গ্রহণ করেছে সেটা ঠিক নয়। তা গ্রহণ করা হয় ১৯৬৫ সালের জানুয়ারীতে। যাহোক নেহরু, যাঁর প্রতি আজাদের সমর্থন ছিল, স্বাধীনতার অনেক আগে থেকেই সমাজতন্ত্রের গুণ প্রচার করছিলেন।

৪৩। ঐ, পৃঃ ১৭৬।

৪৪। ঐ, পৃঃ ১৭৬।

৪৫। পদত্যাগ সম্পর্কে চার্চিল ও নেহরুর বক্তব্য দি কন্সটিটিউয়েন্ট অ্যাসেম্বলি অব ইন্ডিয়া (লেজিস-লেটিভ) ডিবেট, ২য় খন্ড প্রোসিডিংস আদার দ্যান কেয়েশ্চেন অ্যান্ড আন্সার্স" অফিসিয়াল রিপোর্ট, ৬ষ্ঠ খন্ড, ১৯৪৮ ; সেই সঙ্গে তৎকালীন সংবাদপত্রের রিপোর্ট।

৪৬। দি স্টাইসিস অব ইন্ডিয়া, পেঙ্গুইন পেপার-ব্যাক, ১৯৮৫, পৃঃ ৩০৩-০৪।

৪৭। জহরলাল নেহরু, অ্যান অটোবায়োগ্রাফী, পৃঃ ৬৪৭।

# জনস্বার্থ সংক্রান্ত মামলা

অরুণপ্রকাশ চট্টোপাধ্যায়

এখন একটা হুজুগ উঠেছে জনস্বার্থে মামলা করতে হবে। ইংরেজীতে বলা হয় Public Interest Litigation। এর ছোঁয়াচ বিভিন্ন হাইকোর্টে লেগেছে। কলকাতা হাই কোর্টে ও' ঘটেই। এই ও' কিছুদিন আগেই দেখলাম যে, চিফ্‌জাস্টিস বড়ুয়ার এজলাসে রাজেশ খৈতান মহাশয়ের আনা শবাগারের অব্যবস্থা প্রসঙ্গে খুবই হৈ হৈ হ'ল। বিচারপতিও মনে করলেন যে তিনি একটা মহৎ কাজ করছেন। তিনি নিজে মনে না করলেও তাঁকে মনে করানো হ'ল কেননা যে ভাবে পত্রপত্রিকাতে এই মামলার কথা ফেরেও ফুঁড়ে বেরুতে লাগল তাতে যে কোন জজ সাহেবের মনে এই ভাব আসা স্বাভাবিক যে তিনি জনস্বার্থের জন্য একটা কিছু মহৎ কাজ করছেন।

অথচ জনস্বার্থের জন্য একটা কাজ চিফ্‌জাস্টিস বড়ুয়া করতে পারতেন। শবাগারে যেসব কিছু সংখ্যক মৃতদেহ পুলিশের গুলিতে নিহত মানুষের। কেন গুলি করে মারা হ'ল এটা নিয়ে চিফ্‌জাস্টিস যদি অনুসন্ধানের কথা বলতেন তাহ'লে জনস্বার্থমূলক কাজও হ'ত, এবং বিচারকের সত্যকারের ভূমিকা অনুযায়ী কাজ হ'ত।

চিফ্‌জাস্টিস বড়ুয়ার কিন্তু এই সব ব্যাপারে যথেষ্ট অনীহা। কেননা তাঁর কাছে শ্যামপুকুর স্ট্রীটে ছোড়া খুনের ব্যাপারে আমি যখন মামলা করেছিলাম তখন আমার কাছে মনে হয়েছিল অত্যন্ত নগণ্য কারণে চার চারটে পুলিশ অফিসারকে তিনি খালাস দিয়ে দিলেন। স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি যে এই মামলায় নগর ফৌজদারী আদালত ঐ পুলিশ অফিসারদের যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দিয়েছিলেন। নিম্ন কোর্টের সমস্ত কিছু সিদ্ধান্ত চিফ্‌জাস্টিস বড়ুয়া ফুৎকারে উড়িয়ে দিলেন।

ব্যাপারটা প্রণিধানযোগ্য। যে কোর্টে সাক্ষীর তীর্থংকর মামলা নিয়ে এত উত্তাপের সৃষ্টি হয়েছিল সেই কোর্টে এত নিরুত্তাপের সঙ্গে এবং এত সহজে শ্যামপুকুরে রঞ্জিত-সমীরের খুনের আসামী ছাড়া পেল কি করে?

একটা কথা পরিষ্কার করে বলা দরকার। আমাদের দেশের, বিশেষ করে পশ্চিম বাংলার বিচারকমণ্ডলী সাধারণভাবে বলতে গেলে ব্যক্তিগত দিক থেকে সৎ ও ন্যায়নিষ্ঠ। কোন বিচারক স্বার্থপরতার জন্য ন্যায়নিষ্ঠ বিচার করেননি, তা আমি বলছি না। এরকম ঘটনা ঘটে না বললেই চলে।

কিন্তু রাজনীতি বলে একটা জিনিস আছে। লেনিনের সংজ্ঞা অনুযায়ী একটা মানুষের রাজনীতি তার শ্রেণী অবস্থান থেকে উদ্ভূত। কেননা রাজনীতি শ্রেণীসমূহের সম্পর্ক সম্পৃক্ত। কাজেই যেখানে শ্রেণী সংগ্রামের আঁচ আছে সেখানে বুঝতে ভুল হয় না যে বিচার কোন্ দিকে যাবে।

জনস্বার্থ সংক্রান্ত মামলা প্রসঙ্গে কিছুদিন আগে আমেরিকার একজন অধ্যাপক ইণ্ডিয়ান ল' ইনস্টিটিউটে বক্তৃতা দিচ্ছিলেন। আমি তাঁকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম যে, কোন আমেরিকার নাগরিক কি জনস্বার্থ সম্পর্কিত মামলা রুজু করে কোর্টের কাছে যুদ্ধরাষ্ট্রের সমস্ত মজুত আণবিক বোমা ধ্বংস করার হুকুম চাইতে পারেন? কেননা, আণবিক বোমা মানব সভ্যতাকে ধ্বংসের মুখে নিয়ে যাচ্ছে এবং এই ধরণের মামলাকে জনস্বার্থ সম্পর্কিত না বললে আর কোন মামলাকেই জনস্বার্থ সম্পর্কিত মামলা বলা যাবে না। অধ্যাপকটি বয়সে নবীন, এবং মনে হ'ল ধামে ঘেঁষা। তিনি বললেন যে এই ধরণের হুকুমে কোন কোর্টের কাছে চাওয়া যাবে না। তিনি আর একটা কথাও বলেছিলেন যে, জনস্বার্থের মামলা বুর্জোয়া সমাজের কাঠামো বদলাতে সহায়তা করতে পারে না। "বুর্জোয়া" কথাটা ঐ আমেরিকান অধ্যাপকের ব্যবহৃত শব্দ।

আমার মনে হয় যে আইন ব্যবস্থাকে গণমুখী করবার যে চেষ্টা চলছে তারই একটা প্রতিক্রিয়া হিসাবে জনস্বার্থ মামলার কথা আজকাল আমরা হামেশাই শুনছি। নীচের তলার মানুষ দাবী করছেন যে, আইন ব্যবস্থা জনস্বার্থের অনুকূলে আসুক। তাঁরা বলছেন যে বর্তমান আইনব্যবস্থা শোষকের সুবিধার জন্য।

এই দাবী প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে আর এক দাবীতে। সেই দাবী হ'ল—জনস্বার্থ মামলার সুযোগ তৈরী করে দেওয়া। শেষোক্ত দাবী জোলো এবং দুর্বল। এই দাবী জনসাধারণের দাবীকে বিপ্লান্ত করবার পক্ষে যথেষ্ট।

তাছাড়া আইনব্যবস্থার বিরুদ্ধে যে আন্দোলন তার জন্য বিচারকদের সুবুদ্ধির উপর নির্ভরশীল হ'লে চলবে না। তার জন্য সুচিন্তিত হবে যদি দেশের আইন সভা বর্তমান আইন ব্যবস্থাকে পাল্টে দেবার জন্য গণমুখী আইন প্রণয়ন করে।

কিন্তু দুঃখের কথা এই যে, যে কয়েকটি জনস্বার্থমূলক আইন আমাদের বিভিন্ন আইন সভাগুলি প্রণয়ন করতে বাধ্য হয়েছে, সেই আইনগুলিই বিচারকদের হাতে মার খেয়েছে। যেমন, ধরা যাক ১৯৪৭ সালের শ্রমবিরোধ আইন। ইংরেজ আমলের তৈরী আইন। আইনের মূল উদ্দেশ্য ছিল সালিশীর মারফৎ বা বিশেষভাবে গঠিত ট্রাইব্যুনালের মারফৎ মালিক শ্রমিকের বিরোধের মীমাংসা। তার জন্য অতীতের সমস্ত জটিলতা বর্জন করবার প্রতিশ্রুতি ঐ শ্রমবিরোধ আইনে সন্নিবেশিত হয়েছিল। কিন্তু প্রায় চল্লিশ বছর পর শ্রমবিরোধ আইন জটিলতম আইনে পরিণত হয়েছে। আইন অনুযায়ী Evidence Act প্রযোজ্য নয়—অথচ কোর্ট বলেছেন যে ঐ Act এর নীতিসমূহকে মানতে হবে। তার মানে দাঁড়ালো এই যে, Evidence Act এ পারদর্শী লোক ছাড়া শ্রমবিরোধ ট্রাইব্যুনালে শ্রমিকদের পক্ষে সওয়াল কেউই করতে পারবেন না। নানা কূটকচালে প্রশ্ন তুলে শ্রমবিরোধ ট্রাইব্যুনালের রায়কে অকেজো করে দেওয়া আজ সম্ভব হচ্ছে। ভারত ব্যাঙ্ক বনাম ভারত ব্যাঙ্ক শ্রমিক ইউনিয়ন মামলায় বিচারপতি বিজনকুমার মুখার্জী সঠিকভাবেই বললেন যে, সংবিধানের ১০৬ ধারা অনুযায়ী সুপ্রীম কোর্ট শ্রমবিরোধ ট্রাইব্যুনালের রায় থেকে কোন আপীল শুনতে পারে না। কেননা সাক্ষ্য প্রমাণাদির উপর ভিত্তি করে সিদ্ধান্তে আসার দায়িত্ব শ্রমবিরোধ ট্রাইব্যুনালের উপর ন্যস্ত। সুপ্রীম কোর্ট এই সিদ্ধান্ত বদলে দিতে পারে না। অবশ্য ট্রাইব্যুনাল যদি আইনের অপব্যাখ্যা করেন, বা বিচার বহির্ভূত বাইরের কোন ঘটনা বা তথ্যের ভিত্তিতে অযথার কারণে তার ক্ষমতা প্রয়োগ করেন, বা পক্ষসমর্থনের সুযোগ না দিয়ে রায় দেন, তাহলে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি হাইকোর্টে ২২৬ ধারা অনুযায়ী ঐ ভুল পদ্ধতি বা ভুল আইনের ব্যাখ্যাকে সংশোধন করে দেবার জন্য আবেদন করতে পারেন। কিন্তু কোনক্রমেই কোন কোর্ট ট্রাইব্যুনালের তথ্যভিত্তিক কোন সিদ্ধান্তকে এ অজুহাতে নাকচ করে দিতে পারবে না যে, ঐ সাক্ষ্যপ্রমাণাদিতে হাইকোর্ট স্বয়ং মনে করেন যে অন্য সিদ্ধান্তে আসা উচিত ছিল।

বিচারপতি বিজনকুমার মুখার্জীর এই সিদ্ধান্ত আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন, কেননা আমেরিকার এবং ইংলেন্ডে এই রায়ের প্রশংসা রয়েছে। কিন্তু ঐ মামলায় (ভারত ব্যাঙ্ক বনাম কর্মচারী) বিচারপতি মুখার্জী সংখ্যালঘু থাকায় তাঁর মতামতের কোন দাম রইল না। অর্থাৎ সুপ্রীম কোর্ট এখন ১০৬ ধারা অনুযায়ী ট্রাইব্যুনালের রায় থেকে আপীল শুনে আইনের সঠিক ব্যাখ্যা বা পক্ষসমর্থনের সঠিক সুযোগ দেয়া সত্ত্বেও ট্রাইব্যুনালের বহু রায়কে নাকচ করে দিয়েছেন।

আবার হাইকোর্টগুলিও পদ্ধতি বা কেতাবী আইনসিদ্ধ প্রমাণের ওপর অতি বেশী আস্থাশীল হবার জন্য শ্রমবিরোধ ট্রাইব্যুনালের রায়গুলি হয় কার্যকরী করা যায় নি অথবা প্রচুর বিলম্বে কার্যকরী করা গেছে। আমার নিজস্ব অভিজ্ঞতায় বলতে পারি যে, একেনবেরী শ্রমিকদের একটি বিরোধ ট্রাইব্যুনালে গেলে পর মালিক পক্ষ পদ্ধতিগত কূট প্রারম্ভিক পয়েন্ট তুলে ট্রাইব্যুনালকে ২০ বছর ধরে কাজ করতে দেয় নি। বিভিন্ন কোর্ট ঐ পয়েন্টে অন্তর্বর্তী নিষেধাজ্ঞা জারী করে ট্রাইব্যুনালকে বিচার কার্য থেকে বিরত রেখেছেন।

এই সব কথাগুলি বলার উদ্দেশ্য হ'ল যে, যে জনস্বার্থ নিয়ে বিচারক মন্ডলী আজ চিন্তিত হয়ে উঠেছেন, তার যথার্থ রক্ষণ তাঁরা সহজেই করতে পারেন যদি জনস্বার্থে বহু আইনকে পদ্ধতি ও প্রমাণ শাস্ত্রের যূপকাষ্ঠে বলি না দেন। কেউ অস্বীকার করতে পারবেন না যে, শ্রমজীবী জনসাধারণ জনতার এক গুরুত্বপূর্ণ অংশ। এঁদের মঙ্গল জনস্বার্থকে পরিপুষ্ট করবে। বিচারকরা বিমূর্ত জনস্বার্থের কথা চিন্তা না করে শ্রমিক ও কৃষকদের মঙ্গলের কথা চিন্তা করে এঁদের কল্যাণের জন্য যে সমস্ত আইন রচিত হয় সেগুলির ব্যাখ্যা যাতে শ্রমিক ও কৃষকের কল্যাণ বৃদ্ধির সহায়ক হয়

তার জন্য সচেষ্ট হতে পারেন। ব্যবসায়ে মূলধনকে ঠিক মত রাখা হচ্ছে কি না তার চেয়ে শ্রমিক ও কৃষকের প্রশ্ন আরও গুরুত্বপূর্ণ।

ক্ষতিকর বুর্জোয়া সমাজে মন ও বিবেককে ঘুম পাড়ানোর অনেক ব্যবস্থা আছে। তার মধ্যে অন্যতম হল বিশ্বের কল্যাণ বা অধিকারের অনুসরণ করা। যেমন বুর্জোয়ারা সমাজতান্ত্রিক দেশে দেশে মতপ্রকাশের স্বাধীনতা আছে কিনা এই দুশ্চিন্তায় মগ্নমূল। কিন্তু তাঁরা ভেবে দেখেন না বা ইচ্ছা করেই ভেবে দেখেন না যে মতপ্রকাশের স্বাধীনতা উদ্দেশ্যহীন বা বলগাহীন জবলী ঘোড়া নয়। সেই স্বাধীনতার প্রয়োজন মানুষকে সমাজতান্ত্রিক পথে, প্রগতির পথে নিয়ে যাবার জন্য। সমাজতান্ত্রিক দেশে সমাজতন্ত্র গঠনের কাজ এগুচ্ছে কিনা—এটাই গবেষণার বস্তু হওয়া উচিত। বুর্জোয়া সমাজে মতপ্রকাশের স্বাধীনতার প্রয়োজন প্রগতির সংগ্রামের জন্য। সমাজতান্ত্রিক সমাজের মতপ্রকাশের স্বাধীনতা দেশের উৎপাদন বৃদ্ধি করে সমাজতন্ত্রের বনিয়াদ শক্ত করবার জন্য এবং মানুষের হাতে সুলভে ভোগ্যদ্রব্য এনে দেবার জন্য। সোভিয়েত রাশিয়ায় কোন এক নাগরিকের সেখানকার কম্যুনিস্ট পার্টির কোন এক নেতাকে অনর্থক গালি দেবার অধিকার আছে কিনা ঐ নিরিখে ওখানকার ব্যক্তিস্বাধীনতার বিচার করা যায় না।

ঠিক সেই ভাবেই বিশ্বের জনকল্যাণের কথা চিন্তা না করে বিচারক মণ্ডলী যদি কল্যাণমূলক আইনগুলির কল্যাণবর্ধক ব্যাখ্যা করেন তাহলে জনকল্যাণ সত্যিই বৃদ্ধি পাবে।

যুক্তফ্রন্ট সরকার শাসনে আসীন হবার পর বর্গাদারদের হাতে জমি নির্বিঘ্নে চাষ করবার আইনি অধিকার যাতে বজায় থাকে, তার জন্য কয়েকটি বিজ্ঞপ্তি প্রচার করেছিলেন ও বিজ্ঞপ্তি অনুসারে কাজ আরম্ভ করেছিলেন। বিজ্ঞপ্তিগুলি বহু আগে ঘোষিত বর্গাদার সংক্রান্ত আইনগুলি যাতে সুষ্ঠুভাবে প্রযুক্ত হয় তারই জন্যে প্রচারিত হয়েছিল। এই আইন মোটামুটি কংগ্রেসী আমলেই রচিত হয়েছিল এবং এর বক্তব্য সংক্ষিপ্ত। যে সব বর্গাদার চাষ করেন, তারা মালিকের প্রাপ্যাংশ ঠিক সময়ে এবং ঠিক পরিমাণে দিতে থাকলে তাঁদের উচ্ছেদ করা যাবে না। বর্গাদারকে বংশানুগত বলেও ঘোষিত করা হল। কিন্তু আইনকে কার্যকরী না হতে দেবার জন্য এক বিরাট চক্রান্তে জোতদাররা চাষীদের বর্গাদার বলতে অস্বীকার করতে লাগলেন। তাঁরা বর্গাদারদের কাছ থেকে প্রাপ্যাংশ পেলেও তার জন্য কোন রসিদ দিতেন না, এবং বর্গাদারদের কোর্টে বা ট্রাইব্যুনালে কেউ গেলে বলতে লাগলেন। জোতদারদের এই চক্রান্ত ও আইন বিরোধী কাজ বন্ধ করার জন্য যুক্তফ্রন্ট সরকার বিজ্ঞপ্তি প্রচার করে বিভিন্ন এলাকার বর্গাদারদের নথি ভুক্ত করবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন। একথাও বলা হল যে এলাকার জোতদার বা তাঁদের প্রতিনিধিদের সাক্ষ্যতে এবং তাঁদের বক্তব্য শুনেই এই কাজ করা হবে। কিন্তু ঐ আইন বহু ক্ষেত্রে কার্যকরী করা গেল না হাইকোর্টের নিষেধাজ্ঞায়।

কিন্তু এটা ছিল এমন একটা বিষয় যেখানে যে জনস্বার্থের কথা বিচারকরা এখন বলছেন সেই জনস্বার্থের খাতিরেই বিচারকদের কোন নিষেধাজ্ঞা জারী করা উচিত ছিল না। ইতিহাস পড়লেও দেখা যাবে যে, আজকের বর্গাদার গতকালের চাষী। দেনার দায়ে যাঁর কাছে জমি বিক্রী করেছেন, তাঁদের কাছেই ঐ জমিতে ভাগ চাষ করছেন। ম্যাডনামা ইংরেজ প্রশাসক কীল্ডের সমীক্ষায় এই বক্তব্যেরই সমর্থন পাওয়া যাবে। হাইকোর্টের নিষেধাজ্ঞা কৃষিক্ষেত্রে উৎপাদন সম্পর্কে সময়োপযোগী রূপান্তর ও আবর্তনের বাধা হয়ে দাঁড়ালো। লক্ষ লক্ষ একর জমি নিষেধাজ্ঞার নাগপাশে বাঁধা পড়ে গেল।

হয়ত অনেকে বলবেন যে আইন করে কৃষি বিপ্লব আনা যায় না। ঐ তর্কে না ঢুকেও বলতে পারি যে, কোর্ট যদি জনস্বার্থের কথা মনে রাখতেন, তাহলে আইনের মারফৎ কৃষি বিপ্লব না হলেও একটা প্রকৃত ভূমিসংস্কার হতে পারত। এখনও যদি কোর্ট জনস্বার্থের কথা মনে রেখে বিচার করেন, তাহলেও আমূল না হলেও সুদূরপ্রসারী পরিবর্তন বিশেষ করে পশ্চিমবঙ্গে দ্রুত সম্ভব হ'ত। আমাদের সংবিধান ভূমিতে সামন্ততান্ত্রিক উৎপাদন সম্পর্কের বিলোপের সবুজ সঙ্কেত দিয়ে রেখেছে। রাজ্য সরকারগুলি বুকে

সাহস বেঁধে জমিদারী প্রথা অবসান এবং ভূমি সংস্কার আইনগুলি তৈরী করতে লাগলেন, কিন্তু সমস্ত হাই-কোর্টগুলিই ঐ সব আইনের ওপরই নিষেধাজ্ঞা জারী করতে লাগলেন। তখন জওহরলাল নেহেরু প্রধান মন্ত্রী। তিনি ছিলেন খাঁটি বুর্জোয়া। ভূমি সংস্কার বা কৃষিবিপ্লব সম্ভব নয়, তা তিনি বুঝতেন। কোর্ট-গুলির বারংবার আঘাতে বিপর্যস্ত হয়ে সংবিধান সংশোধিত করলেন—৩১ ক এবং ৩১ খ ধারা সন্নিবেশিত হ'ল, যাতে ভূমি সংস্কার আইন-গুলিকে আর মৌলিক অধিকারের অজুহাতে আক্রমণ করা না যায়।

বামফ্রন্ট সরকারের বর্গাদার সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি সংবিধান অনুযায়ীই দেওয়া হয়েছিল। লক্ষ্য করবার বিষয় বর্গাদার সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তিগুলি বামফ্রন্ট সরকারের আমলে দেয়া হলেও বর্গাদার সংক্রান্ত আইন কংগ্রেসী আমলের তৈরী। কিন্তু কংগ্রেসীদের অনেকেই জোতদার ও ভূস্বামীদের সমর্থনের উপর নির্ভরশীল। কাজেই আইন করেও আইনের প্রয়োগে ছিলেন তারা নারাজ। বামফ্রন্ট বেইমান আইন প্রয়োগ করতে সুরু করলেন, অমনি কংগ্রেসীদেরই বাবা বাবা আইনজীবী কোর্ট থেকে নিষেধাজ্ঞা বের করে নিলেন।

আমার বক্তব্য হল এই যে বিচার ব্যবস্থার ভাবমূর্তি দেশের কৃষক ও শ্রমিকের কাছে খুব একটা উজ্জ্বল নয়। বিচারকরা সেটা নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছেন। ঐ জন্যেই বোধ হয় আজ তাঁরা ভাবছেন কী করে বিচার ব্যবস্থাকে জন-সাধারণের কাছাকাছি নিয়ে যাওয়া যায়। তাঁরা এখন গরীবদের আইন-গত সাহায্য দেবার কথা ভাবছেন, আরও বেশী বেশী করে কী করে বিচারালয়কে জনস্বার্থবাহী করা যায়।

আমার অনুরোধ—যদি বিচারকরা বিযুক্ত জনকল্যাণের কথা না চিন্তা করে শ্রমিক কৃষক ও নিম্নমধ্যবিত্তদের কল্যাণের চিন্তা করেন, যে সমস্ত আইন বিভিন্ন রাজ্য সরকার বা স্বয়ং কেন্দ্রীয় সরকার স্বেচ্ছায় বা বাধ্য হয়ে শ্রমিক নিম্নমধ্যবিত্তের স্বার্থে প্রণয়ন করেন, সেই আইনগুলিকে যদি সহজে বাস্তবায়োগ্য বলে গণ্য না করেন বা সেগুলিকে নিষেধাজ্ঞা দিয়ে সহ-সহজেই অকেজো করে না রাখেন তাহলেই জনস্বার্থ রক্ষা কাজ করা হবে। এ দিকে নজর না দিয়ে যদি বিচারকরা কেবল জনস্বার্থের কথা বলেন, সভ্যস্থ বলব যে এইসব উক্তি বিবেকদংশিত মানুষের দুর্বল আত্মপ্রবঞ্চনার চেষ্টার মত দেখাবে।

এ ছাড়াও আমরা দেখি যে কোর্ট ভাঙ্গ ক্ষেত্রে জনস্বার্থমূলক মামলাগুলি সংকৃত সাহিত্যের সেই বিখ্যাত বাক্যটি স্মরণে আনে। শরতের মেঘ গর্জন বা দাম্পত্য কলহের মত "বৃথারম্ভে লঘুক্রিয়া"। যেমন দারভাঙ্গা জেলায় মানুষকে অন্ধ করে দেওয়া—সুপ্রীম কোর্টে মামলা। হৈঠস—সংবাদপত্রে গরম গরম খবর এবং আরও গরম গরম প্রবন্ধ বেরুল। কিন্তু পর্বতের মূষিক প্রসবের মত নিষ্ফল হয়ে রইলো


সরকারী-বেসরকারী প্রভুত্বের কাছে যিনি শিল্পসত্তাকে বন্ধক রাখেননি মিহির আচার্য সেই বিরল লেখকদের অন্যতম। দায়িত্ববান পাঠকদের এই লেখককে জানতেই হবে।

## মিহির আচার্য প্রণীত

বাঙালী বুদ্ধিজীবী মানস ও সমাজভাবনা ১৫·০০
শতবর্ষের আলোকে শরৎচন্দ্র ১০·০০
নির্বাচিত গল্প ১৬·০০
তোমার আমার সকলের জন্য ১২·০০
দ্বিরাগমন ১০·০০ ঘুসর পদাতিক ৮·০০
পরশুরামের কুঠার ১৫·০০ পশ্চিম বাঙলার গল্পসংগ্রহ ১০·০০
জীবন নিরবধি ১৬·০০ পৃথিবীর বয়স ১৪·০০

প্রাপ্তিস্থান ॥ লেখক সমাবেশ ॥ ১৭২/৩৫ আচার্য জগদীশ বসু রোড, কল-১৪
কলেজস্ট্রীট ॥ দে বুক স্টোর্স। কথা ও কাহিনী। নাথ ব্রাদার্স। বৈদ্যা।
নিউ বুক সেন্টার্স। কথাকিরণ।

সুপ্রীম কোর্টের এই সাধু প্রচেষ্টা। জেলার পুলিশের কর্তাদের এ ব্যাপারে কোন বিশেষ কৈফিয়ৎ পর্যন্ত দিতে হল না। যারা অন্ধ করে দিল তাদের শাস্তিবিধানের চেষ্টাও হ'ল না।

জেলে বিচারাধীন বন্দীদের কোর্টে হাজির না করিয়ে বছরের পর বছর আটক রাখা হয়—এ নিয়েও অনেক আলোচনা হয়েছে সুপ্রীম কোর্টে। কিন্তু বিশেষ কিছু ফল হয়েছে বলে আমার জানা নেই। কি করেই বা হবে—সুপ্রীম কোর্টে এ ব্যাপারে উলটো রায় হয়েছে। রাজনৈতিক নেতা রাজনারায়ণ অভিযোগ করেছিলেন যে, কোর্ট তাঁকে হাজির না করিয়েই ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে পুনরায় জেল হাজতে রাখার হুকুম নেয়া হচ্ছিল। সুপ্রীম কোর্ট বললেন যে, ওটা নাকি আইনসঙ্গত, ঐভাবে হুকুম নিলে সে হুকুম বাতিলযোগ্য বলে মনে করা হবে না। আমার মনে হয় যদি সুপ্রীম কোর্ট রাজনারায়ণের মামলায় পরিষ্কার বলে দিতেন যে এইভাবে হাজির না করিয়ে জেলহাজতে রাখার নির্দেশ অবৈধ ও বাতিলযোগ্য তাহ'লে এই দুষ্ট প্রথার মূলেই কুঠারাঘাত করা যেত।

শেষে আর একটা কথা বলেই উপসংহার টানব। কয়েক শত বছর আগে একজন ইংরেজ মনীষী লর্ড বেকন বলেছিলেন যে বিচারকদের কাজ আইন তৈরী করা নয়, আইনের ব্যাখ্যা করা এবং সার্বিকভাবে ব্যাখ্যাত আইনের যথাযথ প্রয়োগ হচ্ছে কিনা সেই ব্যাপারে সিদ্ধান্তে আসা। আমার মনে হয়, বিচারপতিরা সমাজ ও দেশের যথেষ্ট উপকার করতে পারেন তাঁদের এই বিশেষ ভূমিকাকে যদি তাঁরা জনস্বার্থের অনুকূলে সবার পালন করেন। ব্যাখ্যার মারফৎ তাঁরা যে সব জনকল্যাণমূলক আইন প্রণীত হয়ে আছে সেগুলির প্রয়োগ আরও সচল, ও সহজ করে তুলতে পারেন। যাঁরা পাবলিক ইন্টারেস্ট লিটিগেশন-এর কথা বলেন, তাঁরা বিচারপতিদের আইন প্রণেতা বা সমাজ সংস্কারকের ভূমিকায় নিয়ে যেতে চাইছেন। একদা যিনি আইন প্রণয়ন করতেন, তিনিই আইনের প্রয়োগ করতেন ও আইন বিরুদ্ধে কাজ করার জন্য দণ্ডাজ্ঞা দিতেন। আজ সে যুগ নেই। একসঙ্গে প্রশাসক, আইন প্রণেতা ও বিচারক হওয়া সম্ভব নয়। এ ব্যাপারে চেষ্টা বিফল হতে বাধ্য।

# পাইয়ে-দেওয়ার রাজনীতির পাওনা

শ্রীপতি নন্দী

পাইয়ে দেবার রাজনীতির সর্বাপেক্ষা বিপজ্জনক দিকটি এই যে, বিশেষ কিছু পাইয়ে দেয়া যায় না—সীমিত সংখ্যক লোককে অতিরিক্ত সীমিত পরিমাণ কিছু; হয়তো পাইয়ে দেয়া যায়, অতিরিক্ত নয়। অতএব, অচিরেই সে সময়টা এসে যায় যখন বিপুল পরিমাণ হতাশার সম্মুখীন হয়ে এরূপ সরল সহজ রাজনীতিটাও বাটে মারা যায়। আর এ অবস্থার বাজারী পুঁজিতন্ত্রে তো সব কিছুরই পরিধি অনেক বেশী সংকীর্ণ। ফলে, জনসাধারণের কোন কোন অংশ যা-ও যা কিছু পায়, একই সময়ে তার চাইতে ঢের ঢের বেশী গুণে ফিরে তারা বঞ্চিত হতে থাকে—অবশ্যই বাজারী মুদ্রাস্ফীতিতন্ত্রের কল্যাণে। এরেন টুপাইস রাজনীতির অন্ধ পরীক্ষা নিরীক্ষা যে কত বিপজ্জনক সে তো চর্মচক্ষুতেই দেখতে পাওয়া যাচ্ছে।

০ ০ ০

কিন্তু ভারতীয় সংসদীয় 'বামপন্থী' নেতৃত্বকে একথা বোঝায় কার সাধ্য? আর বোঝাতে গেলেই বা ওরা এখন আর তা বুঝতে পারবেন কেন? একটা প্রাণহীন, গতিহীন, জনবুদ্ধিহীন, বাস্তিক পদ্ধতিকে কায়মনোবাক্যে আঁকড়ে ধরে থাকলে চিন্তাশক্তিতেও বন্ধ্যা-যুগ গড়ে উঠতে বাধ্য—তা সে যে যতবড় ধিঙ্গি হয়ে থাকুন না কেন। বলশেভিক নেতারাও এ বিজ্ঞান সম্মত সত্যের ব্যতিক্রম হতে পারেন না। পশ্চিমবঙ্গীয় বামপন্থী চিন্তাধারাতেও ও রাজনীতিতে এ জাতীয় ব্যবস্থার বাস্তিকতার প্রমাণ প্রতিদিন জমে উঠছে। 'জনতন্ত্রের' কৃপায় শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত জীবন যাপনের ব্যবস্থায় যে নয়া 'প্রগতিবাদী' চিন্তাধারার প্রসার ঘটছে, তা নিশ্চয়ই 'সেকেলে' বামপন্থার সমগোত্রীয় অবস্থা সহায়ক হতে পারে না। আর এ অটোমেশনের যুগে চিন্তাবৃত্তিতে খানিকটা অটোমেশনী হস্ত-প্রক্ষেপ উদ্রেক হতে পারে বৈকি। এরা হচ্ছেন

> মনে রাখতে হবে, বন্দুক যেমন বন্দুককে চালাতে চায়, বন্দুকও তেমনি বন্দুকী চরিত্রকে নিশ্চিতরূপে প্রভাবিত করে। শাসক এবং শাসন যন্ত্র সম্পর্কেও একই কথা খাটে।

ঠিক তা-ই। দ্রুত শান্তিপূর্ণ প্রগতির কথা স্মরণ করে আমাদের মডু (Mod) ধারা বাম নেতৃত্ব বুর্জোয়া শাসন ব্যবস্থার ও একচেটিয়া শোষণ ব্যবস্থার প্রধান প্রধান হাতিয়ারগুলো (যথা: অটোমেশন, ন্যাশনালাইজেশন) সম্পর্কে নতুন নতুন 'প্রগতিবাদী' মূল্যায়ন চালিয়ে যাচ্ছেন। বহুরূপী ভাতারী পুঁজিতন্ত্রে অটোমেশন, ন্যাশনালাইজেশন কি আর পর হতে পারে? সে যে আপন জন, শেষ আশ্রয়।

অতএব, শ্রমিক শ্রেণীর চেতনার ও শিক্ষাদীক্ষাগত কর্ম প্রচেষ্টাগুলিও অনুরূপভাবে এগিয়ে চলেছে। নেতারা আজো ধরছেন কখনো কখনো শ্রমিক সমাবেশে বাড়িয়ে শ্রেতাগণকে অর্থনৈতিক আন্দোলনকে রাজনৈতিক আন্দোলনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাবার নির্দেশ দিয়ে থাকেন। কিন্তু নেতৃত্বের করণীয় কাজটা অর্থাৎ এর পথ বাতলে দিতে তারা অক্ষম। স্পষ্টতই দেখা যাচ্ছে, অন্যান্য বুর্জোয়া চিন্তা বিশ্বাসের মত এরাও 'ইকনমিজম্ ইজ কমান্ড' এর নীতিতে আপাদমস্তক ডুবে আছেন, একই প্রকার গ্রেট-ইউনিয়নিজমএর 'আলু'বাদ' ছড়িয়ে তারাও বুর্জোয়া দলগুলির মত শ্রমিক শ্রেণীর একমাত্রকে সাধারণ্যবাদী ধরে নিয়েছেন—অবশ্যই বুর্জোয়াদের সঙ্গে কম্পিটিশন করে। আর শ্রমিক শ্রেণীর সামনে ইকনমিজমএর চাইতে উন্নত রাজনৈতিক পথনির্দেশ না থাকায়, লড়াইয়ের পথ না থাকায়, মেহনতী মানুষ অর্থনীতিবাদের মোহে বিভিন্ন লিবিরে বিভক্ত হয়ে থাকছে, উন্নততর সংগ্রামের মধ্যে মিলিত হবার উপায় খুঁজে পাচ্ছে না। পরিস্থিতিটা এতই ক্লান্তিকর যে, যার দক্ষিণ নির্বাচনের সকল লিবিরই 'দুনিয়ার মজদুর এক হও' ধ্বনি তুলে শ্রমিক শ্রেণীকে একাত্ম করার একমাত্র উপায় তাদের শ্রেণী সংগ্রামের রাজনৈতিক মন্ত্র

থেকে দূরে রাখছে। এর চাইতে বড় তামাশা আর কি হতে পারে?

পশ্চিমবঙ্গে বামফ্রন্ট শাসনের পরিপ্রেক্ষিতে দৃশ্যটা কিরূপ? এখানে বিগত আট বছরে শ্রমিক শ্রেণীর 'অর্থনৈতিক সংগ্রামকে রাজনৈতিক সংগ্রামে উত্তীর্ণ করার' যে দীর্ঘস্থায়ী সুযোগ সুবিধা বামফ্রন্ট পেয়েছিল, জীবনেও তা আর পাবে না। অথচ, এ সমস্ত সম্ভাবনাগুলোকে সর্বাগ্রে আহুতি দেয়া হলো ইকনমিজমের পুষ্টি ও তুষ্টি বিধানের দ্বারা তথাকথিত ক্ষমতায় আরূঢ় থাকার একমাত্র উদ্দেশ্যকে লক্ষ্য রেখেই, একথা গত আট বছরে প্রমাণিত। বামফ্রন্টীরা হয়তো বলবেন, বামফ্রন্ট সরকারকে বাঁচিয়ে রাখতে হলে এবং ইতাবসরে জনগণকে আরো ঐক্যবদ্ধ ও সমাজ-সচেতন করে তুলতে এরূপ একটা লাইনের প্রয়োজন ছিল। তথাপি সংগ্রামবিমুখিতার সাফাই তা প্রমাণিত হয়ে যায় না।

০ ০ ০ ০

আসল কথাটা অন্যত্র। তা না হলে, বিগত কয়েকটা বছর 'গণমুখী' কার্যনির্বাহের পর তার ডিমিনিশিং রিটার্ন দেখে এবং পর পর উপনির্বাচনে জনসমর্থনের উল্টোগতি দেখে বামফ্রন্ট নেতৃত্বকে পুনরায় জনগণের কাছে আবার 'ফিরে যাবার' আওয়াজ দিতে হতো না। মনে রাখতে হবে, যে রাষ্ট্র-ব্যবস্থায় জনগণ বলতে ভোটার মাত্র বোঝায়, সংসদ-সর্বস্ব রাজনীতিকগণ সেক্ষেত্রে তাদের চিন্তায় ও কাজে জনগণকে সংগ্রামী শিক্ষায় শিক্ষিত করে তুলতে অক্ষম, একমাত্র ভোটযন্ত্রের অনুগামী রূপে পেলেই পরিতৃপ্ত—এতাধিক নয়। কিছু গরীব চাষীকে কিছু কিছু ভূমি, খেত-মজুরদের কিছু মজুরী বৃদ্ধি, কিছু মানুষকে কিছু রিলিফ বন্টন নিশ্চয়ই ভাল কাজ, কিন্তু অতঃ কিম? গ্রামে ভূমিহীন চাষীর সংখ্যা বাড়ছে, খেত-মজুরের সরকার নির্ধারিত মজুরী বর্তমান মূল্যসূচী অনুযায়ী নিতান্তই সেকেলে হয়ে দাঁড়িয়েছে, লক্ষ লক্ষ একর জমি আদালতের ইনজাংশন থেকে 'স্ট্যাটাস কুয়ো এস্টে' হয়ে আছে, অথচ সরকারের কিছুই আর করণীয় নেই। আসল কথা, পশ্চিমবঙ্গে বামফ্রন্ট আমলেও সুবিধাভোগী শ্রেণী ও গোষ্ঠীগুলি যথাসম্ভব পরস্পর পরিপূরক হয়ে বেঁচেবর্তে থাকার স্বার্থে প্রয়োজনীয় ইনফ্রাস্ট্রাকচারটিকে কিছুটা বদল করেছে। কিন্তু এতাধিক প্রায় কিছুই এদের বদলাবার নেই।

মোদ্দা কথা, ভূমিহীন আর ভূমি পাবে না, খেতমজুরের মজুরী আন্দোলন দমবন্ধ হয়ে মরছে এবং আমতলাশ্রিত পঞ্চায়েতী অনুগ্রহের নিকট আত্মসমর্পণ ছাড়া গ্রাম বাংলার করণীয় কিছুই নেই। সরকারী আনুকূল্যে শ্রমিক কর্মচারীর মাইনে মজুরীও কিছুটা বেড়েছে, সন্দেহ নেই। কিন্তু, এ সবই তো মূল্যস্ফীতির গতে তলিয়ে যাচ্ছে, এবং আরো কিছু সহ তলিয়ে যাচ্ছে।

এক্ষেত্রে উল্লেখ্য, সরকারী দপ্তরী অমাত্যের মধ্যস্বত্বভোগী জনগণকে কিছুটা মজুরী পাইয়ে দিলে যেমন শ্রমিক শ্রেণীর ও অন্যান্যদের চেতনার মান উন্নয়নে কোন সহায়তা হয় না, শ্রমিক সাধারণও আরো সংগ্রামমুখী হওয়ার ক্ষেত্রে সরকার নির্ভরতার মাধ্যমে 'ওয়েলফেয়ার' পথকেই শ্রেয়তর বিবেচনা করার বিপজ্জনক ঝুঁকির সম্মুখীন হয়ে পড়ে। অতএব, মনে করা চলতে পারে যে, 'জমানা পরিবর্তনের' সঙ্গে সঙ্গে শিবির পরিবর্তনের ঝুঁকিও আনুসঙ্গিক ঝুঁকি হিসাবে স্বাভাবিক ভাবেই দেখা দেবে। আরো লক্ষণীয় যে, গ্রামাঞ্চলের ক্ষুদ্র ও কুটীর শিল্প সহ বৃহত্তর অসংগঠিত সেক্টরে যেখানে বৃহত্তম সংখ্যক শ্রমিক স্বার্থ বিজড়িত, সে সমস্ত ক্ষেত্রে সরকারী প্রশাসনীতি আগেরই মতো অথর্ব, অকেজো। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখযোগ্য, গত বছরকার সিনেমা শিল্পে লাগাতার ধর্মঘটের মীমাংসোৎকল্পে সিনেমা মালিক গোষ্ঠীর দেনার একাংশ সরকারী তহবিল থেকে মিটিয়ে দেবার নজীর-বিহীন দুষ্টচোট সুবিধাবাদী রীতিনীতির এমন একটা বাগ যাকে মালিক শ্রেণীর স্বার্থে ভর্তুকী দানের নীতি ছাড়া আর কিছুই বলা যায় না। অতঃপর বৃহত্তর ক্ষেত্রে ধর্মঘটী শ্রমিকরাও যদি একই রূপ সহজ সমাধানের আশা পোষণ করে, এবং সরকারী টাকার অর্থাৎ জনসাধারণের টাকায় মালিকদের প্রদেয় অর্থের ভর্তুকী দাবী করে তখন? সংগ্রামের রাজনৈতিক উত্তরণ কি এ ভাবেই হবে? এতো গেল, বামফ্রন্ট কর্তৃক জনগণকে সমাজসচেতন ও শ্রেণীসচেতন করে তোলার মোড়।

০ ০ ০ ০

তারপরও রয়েছে, একই পাইপে দেবার রাজনীতি থেকে উদ্ভূত উপসর্গগুলি, যেগুলি চারিদিকে ভালপালা ছড়িয়ে সামাজিক জটিলতা

সৃষ্টি করে চলেছে। যেমন, সরকারী আধা-সরকারী অধিগৃহীত সংস্থাগুলিতে যথা, ট্রাম-ওয়েজ, রাষ্ট্রীয় পরিবহন, কর্পোরেশন, গ্রাকোনেট, বসুমতী এবং সর্বোপরি পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদ সহ রাজ্যের দুই সত্তাধিক পৌর সংস্থাগুলিতেও সরকারী তহবিল থেকে নিয়মিত ভর্তুকীদানের ব্যবস্থা। কারণগুলি অবশ্যই প্রশাসনিক অযোগ্যতা, দায়দায়িত্বহীন দুর্নীতি, অপচয়, ভ্রান্ত করনীতি ইত্যাদি বহু কিছু। অথচ, এ সমস্ত অনাচারী শক্তিগুলোকেই পরিপোষণ করে চলতে হচ্ছে জনস্বার্থে ব্যয় সঙ্কোচ করে। কারণগুলি কেন দূরীভূত হচ্ছে না, কারা দায়ী এ সমস্ত প্রশ্ন এখানে অপ্রাসঙ্গিক মনে করেও কি এ কথা বলা যায় না যে, এ পুঁজিবাদী সমাজে সহর কর্তৃক গ্রামাঞ্চলকে শোষণ করার অন্যান্য ব্যবস্থার সঙ্গে এটাও একটা সংযোজিত ব্যবস্থা হয়ে দাঁড়িয়েছে যেক্ষেত্রে রাজ্য সরকারের দায়িত্ব প্রত্যক্ষ। রাজ্য সরকারের রাজস্ব আদায় ব্যবস্থা ও বন্টন ব্যবস্থা পর্যালোচনা করলে উপরোক্ত সিদ্ধান্তকে উড়িয়ে দেয়া যায় না। অবশ্য, এ কথাও মানতে হবে, সহর কর্তৃক গ্রাম শোষণের যে সমস্ত দানবীয় ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত আছে, সে তুলনায় এটি অতি নগণ্য এবং প্রচলিত সমাজ ব্যবস্থা। সহর কর্তৃক গ্রামাঞ্চল শোষণের যত রকম ব্যবস্থা রয়েছে তার কোনটাকেই লাঘব করার কোন ক্ষমতা কোন রাজ্য সরকারেরই নেই তা বামফ্রন্টী সরকার হলেও না। তাহলেও বিষয়টি উপলব্ধির প্রয়োজনীয়তা এই যে, পাইয়ে-দেওয়া-বুর্জোয়া পাইয়ে দেয়া রাজনীতিটা এমনই অন্ধ যে, ছোট বড় সব কিছুকেই অতিসরল নিয়মতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গীতে দেখে, ব্যাপারগুলিকে তাদের বিশেষ বিশেষ দার্শনিক পরিচয়ে দেখে না। একজন অন্ধ কোনও অন্ধগলিতে ঢুকে পড়লেও সে বেরিয়ে যাবার পথ খুঁজে পেতে পারে, কেননা গলির সীমান্তে পৌঁছে সে বাধা পায়, ফিরে যাবার নির্দেশ পেয়ে যায়। কিন্তু অন্ধ রাজনীতি কখনো ফিরে যাবার রাস্তা রেখে যায় না। বামফ্রন্ট ও বামফ্রন্ট সরকারের ব্যর্থতার পরিচয় এখানেই। বেকার সমস্যা, বিদ্যুৎ সমস্যা, 'আইন শৃঙ্খলা সমস্যা', দুর্নীতি সমস্যা কিংবা ধরুন বৃদ্ধি সমস্যা সমাধানে ব্যর্থতার জন্যে বামফ্রন্ট সরকার দায়ী নয়, কেননা, এগুলি ভারতীয় পুঁজিবাদের সৃষ্ট সমস্যা। অবশ্য অন্ধ রাজনীতির অপরিণামদর্শিতার কারণে বামফ্রন্ট এ সমস্ত সমস্যা সম্পর্কেও নির্বাচনী ইস্তাহারে এবং নির্বাচনের পরেও নানা গালভরা প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল।

বামফ্রন্ট হয়ত সত্যি সত্যি বিশ্বাস করতেন তারা জনসাধারণকে অনেক কিছু পাইয়ে দিয়ে তাদের চিরসাথী করে ধরে রাখতে পারবেন এবং উপযুক্ত সময়ে (?) তাদের বহুস্তর গণসংগ্রামের (?) পথে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারবেন। তাহলেও তাদের এজাতীয় বিশ্বাস আর যাই হোক না কেন, অন্ততঃ বামপন্থী রাজনীতি সম্মত নয়, এটুকুতো স্থির নিশ্চয়।

একই পাতি-বুর্জোয়া নিয়মতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গীর প্রভাবে তথা দার্শনিক বিচার-বিশ্লেষণের ব্যর্থতায় বামফ্রন্ট ভারতীয় রাষ্ট্র ও রাজ্য এবং রাষ্ট্র ও জনগণের সম্পর্ক নির্ধারণের ক্ষেত্রে শোচনীয়তম ব্যর্থতার পরিচয় রেখেছে। অন্তর্ভুক্ত দলগুলি তাদের বিভিন্ন পার্টি কংগ্রেসে যা কিছুই রাজনৈতিক প্রস্তাব পাঠ করে থাকুক না কেন, সংসদীয় গন্ডীর বাইরে (extra-parliamentary) সাংগঠনিক বিস্তারের ও সংগ্রামের কোনরূপ মানসিক প্রস্তুতি তাদের বিগত তিন দশকের কোনকালেই ছিল না, এখন তো সে প্রশ্নই ওঠে না। এমতাবস্থায়, রাজনৈতিক প্রস্তাবে যা উহ্য থাকে, কার্যক্ষেত্রে তাই ব্যক্ত হয়ে পড়ে। স্বভাবতই সংসদীয় খুপড়ী সর্বস্ব রাজনীতির উপর পরিপূর্ণভাবে নির্ভরশীল হওয়া ছাড়া এদের গত্যন্তর নেই। পাইয়ে দেবার রাজনীতি ছাড়া করণীয়ও আর কিছুই নেই। আবার বলতে হয়, পাইয়ে দেয়ার রাজনীতি বিশেষ কিছুই পাইয়ে দিতে পারে না, কিন্তু জনগণকে সরকার নির্ভর ও প্রত্যাশাবাদী করে তোলে। স্বভাবতই এখানে অন্তরায় সে একই রাষ্ট্রব্যবস্থা, যার সর্বাত্মক নেতৃত্ব কেন্দ্রীয় শাসক নেতৃত্বে নিহিত। কিন্তু এর বিরুদ্ধে জনগণকে সম্ভাব্যরূপ সম্ভাব্য উপায়ে প্রতিরোধের পথে সংগঠিত না করে, কেন্দ্রকে মাতৃরূপে মূল্যায়ন করে তার 'বিমাতৃসুলভ আচরণের' বিরুদ্ধে সন্তান-সুলভ অভিমানী বিক্ষোভ প্রদর্শনের পথ তারাই বাছে যারা ভারতীয় রাষ্ট্র ব্যবস্থার গণদ্রোহী শ্রেণী চরিত্রকে

# মৃণাল সেন এখন ভগ্নস্তূপ

সমর বন্দ্যোপাধ্যায়

মৃণাল সেনের 'খণ্ডহর' ছবিটি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। এই কারণে যে ছবিটির বিষয়বস্তুর মধ্যেই চলচ্চিত্রকার মৃণাল সেনের অবস্থার সমীকরণ হয়তো অজ্ঞাতেই সম্ভাব্য হয়ে গেছে। ছবিতে দৃশ্যায়িত অট্টালিকার ভগ্নাবশেষের তলায় চাপা পড়ে মৃণাল সেন নিজেই বুঝি আজ ভগ্নস্তূপে পরিণত।

'আকাশের সন্ধানে', 'বাইশে' ছবির পর 'খণ্ডহর' নির্মাণ যতখানি বিস্ময়কর, তার চেয়েও বেশি বিস্ময়কর তাঁর কয়েকটি সাম্প্রতিক কথা। গোয়েতে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্রোৎসবের উদ্বোধন হয় 'খণ্ডহর' ছবিটি দিয়ে এবং ছবির প্রদর্শনীর প্রাক্কালে পরিচালক মৃণাল সেন এক ভাষণে বলেন যে, গভীর উপলব্ধি জাত সত্য ও সৌন্দর্যের উদ্ঘাটন হবে এবার থেকে তাঁর ছবির ভূমিকা—আর স্লোগান নয় মিছিল নয় বিক্ষোভ বিদ্রোহ নয় শুধু সৌন্দর্যানুসন্ধান। 'খণ্ডহর' থেকে এই নবীন যাত্রা। আগে যত ছবি করেছেন, সবই ভুল করেছেন। কি ধারাভাষ্যকর কথা! তিল তিল করে গড়ে ওঠা এতদিনের অভিজ্ঞতাকে তিনি নিজেই অস্বীকার করে বসলেন!

মৃণাল সেনকে বলা হত রাজনৈতিক চলচ্চিত্রকার, কেউ কেউ বলতেন প্রগতি শিবিরের পরিচালক। কারণ তাঁর ছবিতে রাজনীতির প্রসঙ্গ কিছু থাকত, থাকত মুক্তিযোদ্ধাদের লড়াই, শাসিত ও শোষিত জনগণের দুর্দশার কথা। যদিও সেগুলি থাকত ভাসা ভাসা, কার্যকারণের যুক্তিবিহীন, অসঙ্গতির ও বিশ্লেষণ ছাড়া। তবু যাই হোক, মৃণাল সেনেরই ছবিতে জনগণের অস্তিত্বের সমস্যার কিছু প্রসঙ্গ উচ্চারিত হত, যা সত্যজিৎ রায়ের ছবিতে অনুচ্চারিত। সত্যজিৎ রায় সেখানে শিল্প একলার সৌন্দর্য পিয়াসী, যা প্রয়াসই জনগণের অস্তিত্ব সংকটের উত্তরণে দিশারী হয়ে ওঠে না। দীর্ঘদিনের ব্যবধানে সত্যজিৎ যেমন স্বতন্ত্রিতে প্রতিষ্ঠিত, তেমনি মৃণাল সেনও বিশিষ্ট ধরণায় নিজের জমিতে পা রেখেছেন। আজ তিনি নিজেই পায়ের তলা থেকে সেই জমিটা সরিয়ে নিয়েছেন।

মৃণাল সেন ছবি করছেন অনেকদিন থেকে। পঞ্চাশ দশকের 'রাতভোর' থেকে শুরু বলা যায়। প্রথমদিকে ছবিতে থাকত প্রথাসিদ্ধ যুবার নরনারীর সম্পর্ক, সাংসারিক সমস্যা, জটিল সমাজ ব্যবস্থা প্রভৃতি। ছবিগুলি সার্থকতা তেমন পেত না—বড় অভিনয় জয় করতে ব্যর্থ হত। তবু তিনি ছবি করে গেছেন, থামেননি। তাঁর ছবিগুলি একটা বিশেষ চরিত্রের আকার নিয়ে বিশিষ্ট সৃষ্টি হয়ে ওঠেনি তখন—গুড়িকা স্রোতে ভেসে গেছে। তখনকার

---

কার্যতঃ আড়াল করে রাখতে চায়, এবং সংসদীয় গণতন্ত্রের স্বরূপ উদ্ঘাটন করতে মোটেই আগ্রহী নয়, কিন্তু জনসাধারণকে এমেলে-নির্ভর মন্ত্রী-নির্ভর করে রাখতে আগ্রহী, তাদের ব্যবসায়ীর বিক্ষোভকে বুর্জোয়া মার্কা ট্রেড ইউনিয়নিজমে আবদ্ধ করে রাখতে সদা তৎপর। তথাকথিত এরূপ দৃষ্টিভঙ্গী স্বাভাবিক বামপন্থার সম্পূর্ণ বিরোধী। একই কারণে স্বভাবতই, একদিনের উচ্চারিত 'জাতীয় গণতান্ত্রিক বিপ্লব,' 'নয়া গণতান্ত্রিক (জনগণতান্ত্রিক) বিপ্লব,' কিংবা 'সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব' শব্দগুলিকেও ওরা আজ আর ভুলেও উচ্চারণ করে না, সমাজ বিপ্লবের ঐতিহাসিক অবশ্যম্ভাবিতা সম্পর্কে' একটা টুঁ শব্দকেও এরা ঘুণ্যিমানের মত এড়িয়ে চলে। অতএব স্বভাবতই যা ঘটবার তা-ই ঘটছে—বামফ্রন্টের দলগুলিতে ও বহুস্তর মেহনতী সমাজে পাতি-বুর্জোয়া ব্যভিচার ছড়িয়ে পড়ছে এবং শ্রমিক শ্রেণীর নেতৃত্বে জনগণের মধ্যে ঐক্য সংহতি ও রাজনৈতিক শ্রেণী সংগ্রামের প্রস্তুতি গড়ে তোলার পক্ষে গুরুতর জটিলতা সৃষ্টি করে চলেছে। একই প্রক্রিয়ার একই সঙ্গে বামফ্রন্টের অন্তর্ভুক্ত দলগুলির 'বাম চরিত্র' সম্পর্কে জনগণের তৎকালীন আস্থাটুকুও ম্লান হতে হতে এখন যদি এক নিম্নতম স্তরে এসে ঠেকে থাকে তাহলে এজন্যে দায়ী কারা? সৎ সংগ্রামী কর্মীদলকেই সে কথা ভেবে দেখতে হবে।

সময়ের ফসল আর পাঁচটা ছবির দশা যেমন হয়—তাঁর ছবিগুলির অবস্থাও ছিল তেমনি, তার বেশি কিছু বলে অন্তত তিনি ভাবতে পারেননি। 'বাইশে শ্রাবণ' আর 'প্রতিনিধি' ছবি দুটি সে সময় কিছু দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। 'বাইশে শ্রাবণ' ছবির নামকরণের মধ্যে পরিচালকের প্রথা বিরোধী মানসিকতার প্রথম পরিচয় পাওয়া যায়, যা অবশ্য বক্তিম যেমন টেকেনি। ঠিক এই মানসিকতাই প্রকাশ পেয়েছিল পরবর্তীকালে 'পরশুরাম' ছবির নামকরণে, যা তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে ওঠেনি। 'বাইশে শ্রাবণ' আমাদের কাছে রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুদিবস হিসেবে স্মরণীয় হয়ে আছে। পরিচালক এখানে ঐ তারিখটি বিবাহের দিন হিসেবে ব্যবহার করেছেন। ঐ তারিখে অবশ্য বিবাহ হতেই পারে সেটা বড় কথা নয়। একটা নামকরণ যখন সেই নির্দিষ্ট তারিখকেই সূচিত করে, তখন বিভ্রান্তি আসেই। বাস্তব সত্যকে যখন শিল্পসত্যের রূপ দিতে হয় তখন ব্যক্তিরূপ বিচার করে হয় না—বিচার করতে হয় সর্বজনীনতার কথা ভেবে। ঠিক তেমনি 'পরশুরাম'—পৌরাণিক সেই বিখ্যাত নামটি যখন আধুনিক এক ছবির নামকরণ হয়—তখন বিভ্রান্তি আসবেই। এই নামে লোক থাকতেই পারে কিন্তু তাকে শিল্পসত্যের রূপ দিতে গেলে সর্বজনীন আবেদনের কথা বিস্মৃত হলে কি চলে? ছবিতে আমরা দেখি, 'পরশুরাম' নামে ভদ্রলোকটির কাঁধে কুঠার—এই কুঠার দিয়ে একদা সে বাঘ শিকার করেছিল—কিন্তু তা দিয়ে বর্তমানে সামাজিক অসাম্যের বিরুদ্ধে কোনো ঘোষণা সে করেনি। তাহলে এটা যায়, তাহলে যা অবকাশ কোথায়? 'প্রতিনিধি' ছবির দেবাংশে চিত্রচরিত্র ধারায় শিকার হয়েছেন পরিচালক। গল্পকার অচিন্ত্য সেনগুপ্তের পক্ষে যা সম্ভব হয়নি, মৃণাল সেনের পক্ষেও তা অসম্ভব হবে কেন? যদি তাই হবে তবে এ গল্প নির্বাচন হল কেন। ছবির সম্পর্কিত্বকে দাবী করে নায়ক নায়িকার মিলন, ব্যতিক্রম নয়। 'আকাশ কুসুম' ছবিটাও গ্রহণযোগ্য হয়ে ওঠেনা। স্টিল ছবির ছড়াছড়ি ছবিটিকে স্টাইলিশ করে যায়।

হিন্দি 'ভুবন সোম' ছবি থেকে বোধকরি মৃণাল সেনের নতুন পদযাত্রা। এ ছবিতে ক্যামেরা এক বিশেষ ভূমিকা নেয় এবং পরবর্তী ছবিগুলিতে ক্যামেরার বিশেষ ভূমিকা বিদ্যমান। ছবির ট্রিটমেন্টও পালটে যায়, পালটে যায় দৃষ্টিভঙ্গীও। নিসর্গ দৃশ্য, মানসিক গতি, অন্তর্দ্বন্দ্ব প্রভৃতি সব কিছুই নিপুণ সমন্বয়ে প্রকাশ হয়। ছবির বক্তব্য উৎকোচ বিরোধী হলেও, শেষ দৃশ্যে যে সংলাপ শোনা যায়, তা কিন্তু ঘোরালোর সৃষ্টি করে। বুকেরা পুলিশকে সৎ প্রৌঢ় অফিসার যা বলে তার মর্মার্থ হল—এমন জায়গায় বদলি করে দেব, যেখানে আছা তুলোধোনা মিলবেনা। এই উক্তি কিন্তু স্পষ্ট নয়—বক্তব্য এতে জোরালো হয় না। বাংলা 'ইন্টারভিউ' ছবিতে অ্যান্টি এস্টাবলিশমেন্টের প্রসঙ্গ আছে, কিন্তু তা বুদ্ধিসম্মত হয়ে ওঠেনি। অ্যান্টি কিংস বা রেবতীদান পদ্ধতিতে 'ইলিউশান' ভাঙার চেষ্টাও দেখা যায় ছবিতে, যা কেউ হাস্যকর হয়ে ওঠে। ছবির মধ্যে ট্রামে যেতে যেতে রঞ্জিত মল্লিককে হঠাৎ বলতে শোনা যায়—কলুপো বন্দ্যোপাধ্যায় আমার যা সেজেছেন এখানে। পরিচালক মৃণাল সেন কায়েমীস্বার্থ নিয়ে এখন অমায় পিছনে ধাওয়া করেছেন ইত্যাদি কথা এই মর্মে। ছবিতে এসব উদ্ভট কাণ্ড দেখে চমকে যেতে হয়। যদি এমনটাই পরিচালকের মনে ছিল—তবে গোড়া থেকেই ছবি সেরকম হোলনা কেন—সুদূর ব্যবধানেই এই খাপছাড়া ব্যাপারটা এমনভাবে প্রশ্রয় পেয়ে হাসির খোরাক হয়ে উঠল কেন? 'কলকাতা '৭১' ছবি করার পর মৃণাল সেন রাজনৈতিক চলচ্চিত্রকার হিসেবে পরিচিত হন। তখন নকশাল আন্দোলন তুঙ্গে এবং রাজনৈতিক অস্থিরতা দারুণ। সেই পরিপ্রেক্ষিতে ছবিখানি সি পি এমের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। পাঁচটি খণ্ড কাহিনীর সমাহার ছবিটি। প্রথম ও শেষ দুটি কাহিনী রাজনীতি প্রসঙ্গে এবং মাঝের তিনটি সাহিত্যের গল্প অবলম্বনে, প্রশংসা সচেতন অবশ্যই। কিন্তু কাহিনীগুলির গ্রথন উপযুক্ত হয়নি। তবে ছবিটি সেসময় আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। 'পদাতিক' ছবিটিও রাজনৈতিক, কিন্তু তা হয়ে ওঠে প্রতিক্রিয়াশীল, যা বাঞ্ছনীয় নয়। 'কোরাস' ছবিটিও একাধিক কাহিনীর সমষ্টি কিন্তু তা অনেক বেশী রাজনীতি সচেতন এবং প্রশংসার যোগ্য। এসব ছবিতে কিন্তু লিখিত কথার ব্যবহার খুব বেশী। যা

যাবে না। 'একদিন প্রতিদিন' ছবিতে মেয়েদের সম্পর্কে চারপাশের লোকজন ও সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গীর সংকীর্ণ পরিচয় কিছু পাওয়া যায়। কিন্তু রাজনীতির প্রসঙ্গ মূল কাহিনীতে থাকলেও ছবিতে তা অনুপস্থিত থাকায় রাজনীতি সচেতনতার অভাব থেকে গেছে, যা থেকে চলচ্চিত্রকারের ভগ্ন মানসিকতার পরিচয় পাওয়া যায়। 'পদাতিক' ছবিতে ফুটপাথবাসীদের সমস্যা ও মানসিকতার সঠিক পরিচয় পাওয়া যায়নি, পরিবর্তে তাদের নিয়ে মেকি ধরণের ছবি ফুটে উঠেছে এবং চলচ্চিত্রকার মৃণাল সেনের এটি ব্যর্থতা বিসাদ ঘটে। 'আকালের সন্ধানে' ছবিতে পরিচালক মন ও মানসিকতার দিকে আলো ফেলে তার জটিলতার সন্ধান দিয়েছেন এবং সঙ্গে সঙ্গে নিজের সীমাবদ্ধতা ও দুর্বলতার পরিচয় দিয়ে ফেলেছেন। 'খারিজ' ছবিটি পরিচালকের শক্তিক্ষয় বা বলিষ্ঠতার অভাবের পরিচায়ক। সমস্যার আবর্ত সৃষ্টি করে রাজনীতির ঘুর্ণাচক্রে তিনি পরিণতি দেখিয়েছেন আত্মসর্পণে, প্রতিবাদ ও বলিষ্ঠ চেতনার ইতিবাচক ব্যঞ্জনা সেখানে একেবারেই নেই। তাই ছবির নাম এবং পরিচালকের প্রচেষ্টা এখানে সমার্থবোধক হয়ে দাঁড়িয়েছে। ভুবন-নায় ওড়িয়া ছবি 'মাটির মানষ' ও তেলেগু ছবি 'অঙ্কুর' অনেক বলিষ্ঠ ও রাজনীতি সচেতন।

রাজনীতির গভীরতা ও গভীর সচেতনতার স্বাক্ষর মৃণাল সেনের ছবিতে না থাকলেও তিনি জনগণের পক্ষে থেকে শোষণ ও দুঃশাসনের বিরুদ্ধে, সামাজিক বৈষম্য ও অনাচারের বিপক্ষে এতকাল সোচ্চার ছিলেন, ছিলেন সুস্থ ও স্বাভাবিক জীবনের পক্ষে যোগানদুক্ষর ও জীবিকা ও অস্তিত্বের স্বার্থে সংগ্রামী, একথা মিথ্যে নয়। আজ এগুলি যখন অস্বীকার করেন মৃণাল সেন, তখন বিস্ময় লাগে এই ভেবে যে, এতকাল বাদে এই বয়সে এই প্রতিক্রিয়াশীল বিপরীত চিন্তা কেন? জনগণের সপক্ষে তাঁর লড়াই কি ছিল তবে মেকি, ভন্ডামী সর্বস্ব, না তিনি পরীক্ষা করে দেখছিলেন, এই সংগ্রামী ভূমিকায় থেকে তাঁর লাভালাভ কি হয়? নিজের কেরিয়ার গড়ার জন্য এই লড়াকু ভূমিকা কি তিনি নিয়েছিলেন? যদি তাই হয়, তবে 'খন্ডহর' নির্মাণের মধ্য দিয়ে তাকে নস্যাৎ করলেন কোন বুদ্ধিতে? সত্যজিৎ-রায় এতকাল জনগণের বিপক্ষে থেকে শিল্পসৃষ্টির মধ্য দিয়ে যে 'ইমেজ' গড়েছেন, মৃণাল সেন এতকাল পর নিজে জাদুমূর্তি চূর্ণ করে, সেই 'ইমেজ' গড়তে চাইছেন কি সত্যজিতের পথে? সত্যজিতের সমান যশপ্রার্থী হয়ে যদি তিনি আজ শোষণবাদীর ভূমিকা নিয়ে থাকেন, তবে আর যা কিছু হোক, এই বয়সে তিনি মরীচিকার শিকার হলেন, কোন সন্দেহ নেই। ফ্রান্সের রাজনীতি সচেতন চলচ্চিত্রকার জাঁ লুক গদার যখন বলেন ফিল্ম হচ্ছে বন্দুকের নল, তখন আজ মৃণাল সেন বলেন, ফিল্ম হচ্ছে সুন্দর শিল্প সৌন্দর্য সৃষ্টির মাধ্যম। এই উক্তি থেকেই স্পষ্ট হয় তৃতীয় বিশ্বের নিপীড়িত ও শোষিত জনগণের বিপক্ষে থেকে একদা রাজনীতিক মৃণাল সেন চলচ্চিত্রকে লড়াইয়ের অন্যতম হাতিয়ার আর মনে করেন না। তিনি স্বয়ং আজ 'খন্ডহর'এ পরিণত হয়েছেন।

# পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক ও সামাজিক চিত্র

ফণী চক্রবর্তী

এ সত্য অস্বীকার করার উপায় নেই যে, অন্য অনেক প্রদেশের তুলনায় পশ্চিমবঙ্গ শান্তিপূর্ণ। ইন্দিরা কংগ্রেস ও অন্য কয়েকটি দল এর বিপরীত যা-ই বলুক না কেন এবং বামফ্রন্টের বিরুদ্ধে এদের নেতারা যতই সোচ্চার হন না কেন এটাই সত্য কথা। উত্তরপ্রদেশ, মহারাষ্ট্র, গুজরাটের মত কোন বড় রকমের সাম্প্রদায়িক গোলযোগ অথবা আসামের ভাষা ভিত্তিক দাঙ্গা পশ্চিমবঙ্গে হয়নি।

গত এক বছরে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার একটিমাত্র ঘটনা ঘটেছে বাংলাদেশ সীমান্ত নদীয়ার, কড়া হাতে পুলিশী ব্যবস্থা দাঙ্গাকে দমন করা হয় এবং তারপর মুখ্যমন্ত্রী অন্যান্য দলগুলি ও তাদের অনুসারীরা সেখানে শান্তি মিছিল বার করেন। লক্ষণীয় যে, পূর্বোক্ত রাজ্যগুলির মত এখানে পরিস্থিতির মোকাবিলার জন্য সামরিক বাহিনীকে ডাকতে হয় নি।

পঞ্চায়েত নির্বাচনের মুখে রাজনৈতিক খুন ও সংঘর্ষ হয় প্রধানতঃ ইন্দিরা কংগ্রেস ও সি পি আই (এম)-এর মধ্যে এবং নিরীহ নিরোধী লোকেদের অপ্রাণ ঘটিয়ে এখনো কয়েকটি জায়গায় তার জের চলছে।

গত বিধানসভা নির্বাচনের আগে ও পরে উত্তরবঙ্গের কয়েকটি জেলায় আসাম থেকে বহু লোক চলে আসার ফলে যে পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছিল রাজ্য সরকার যেভাবে তার মোকাবিলা করেন তা বিশেষভাবে প্রশংসনীয়। প্রকৃতপক্ষে পশ্চিমবঙ্গই একমাত্র রাজ্য, যে আসাম আন্দোলন সম্পর্কে শ্রীমতী গান্ধীর বক্তব্যের সঙ্গে একমত যে, এই আন্দোলন "বিচ্ছিন্নতাবাদী"।

কাজের বদলে খাদ্য কর্মসূচী, এন আর ই পি, অক্ষম বৃদ্ধ চাষীদের পেন্সন, বিধবাদের পেন্সনের ভিত্তি ব্যাপক করা, দুর্ঘটনায় মৃত নিম্ন বেতনের কর্মচারীদের বিধবাদের চাকরী দেওয়ার পরিকল্পনা সাধারণ মানুষের মনে অনুকূল মনোভাব সৃষ্টি করেছে।

সরকারের আরো কয়েকটি কৃতিত্ব হল, ২০ লক্ষের মধ্যে ১২ লক্ষ বর্গাদারকে নথিভুক্ত করা, ৬ লক্ষ উদ্বৃত্ত জমি গ্রামের গরীবদের মধ্যে বিতরণ এবং পশ্চিমবঙ্গ ভূমি সংস্কার বিল (দ্বিতীয়) সংশোধনী বিল, যা ল্যান্ড সিলিং আইনের ত্রুটিগুলি দূর করতে পারে কিন্তু রাষ্ট্রপতির সম্মতি না পাওয়ার জন্য কার্যকর করা যাচ্ছে না।

সমবায় ব্যাঙ্ক মারফৎ ঋণ হিসাবে কৃষকদের কিছু সুবিধা দেওয়া হয়েছে কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে আদায়ের পরিমাণ খুবই কম এবং আদায়ের জন্য প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণে পঞ্চায়েত, এমন কি কিসান সভাও রাজি নয়। সেচের জন্য জলকর আদায়ের ক্ষেত্রেও একই অবস্থা, একইভাবে বাকি পড়ে আছে। নীচের তলার দলের কার্যকলাপ স্বল্পকালীন ও দীর্ঘকালীন প্রকল্প সম্পর্কে জনসাধারণকে অবহিত করতে ব্যর্থ হয়েছে। "দাও এবং নাও" এই নীতি ছাড়া সেবোন্ত প্রকল্প কার্যকর করা যাবে না। জনসাধারণের মনে এই ধারণা হয়েছে যে, একবার টাকা নিলে তা আর ফেরত দিতে হবে না। টাকা আদায় না হলে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধিতে এবং সেচের সুবিধার দ্রুত প্রসারে ব্যাঙ্কের সুবিধা দেবার চেষ্টা ব্যর্থ হতে বাধ্য।

গ্রামাঞ্চলের এই দৃশ্যের সঙ্গে শহরের পরিস্থিতিও খুব সন্তোষজনক নয়, যা প্রতিফলিত হয়েছে সাম্প্রতিক উপ-নির্বাচন ও হাওড়া পুরসভার বামফ্রন্টের জনপ্রিয়তায় ভাঙনে। শহরের লোকদের অভিযোগ দ্রব্যমূল্যবৃদ্ধি, প্রচণ্ড লোড-শেডিং, পরিবহন ব্যবস্থার ব্যর্থতা ও যানজট ও সমাজ বিরোধীদের উত্থানের বিরুদ্ধে সক্রিয় ব্যবস্থা গ্রহণের অভাব সম্পর্কে, সাধারণ লোক যাদের তাণ্ডবের মুখে পড়ে।

রাজ্য সরকার মেহনতী মানুষ ও উচ্চ বেতনভোগী কর্মচারীদের মধ্যে ট্রেড ইউনিয়ন অধিকার বাড়াতে খুব ইচ্ছুক, কিন্তু তাঁরা তাঁদের সাংগঠনিক কর্তব্যে সাড়া দেননি। ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার এবং অন্যান্য সরকারী কর্মচারীদের মনোভাব থেকে এটা বোঝা যায়। তাঁদের ক্রমবর্ধমান দাবীর কোন সীমা নেই। প্রকৃতপক্ষে জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে "কাজ নয়" আবহাওয়া বিরাজ করছে। এটা কেবলমাত্র বেসরকারী মালিকানার বা সরকার নিয়ন্ত্রণাধীন সংস্থার আছে তা নয়, সরকারী বা আধা সরকারী প্রতিষ্ঠানেও এই অবস্থা।

"কাজ নয়" আবহাওয়া দূর করতে দুটি জিনিস করতে হবে। এক; পশ্চিমবঙ্গের অর্থনৈতিক উন্নতির জন্য এখানে প্রভূত পরিমাণে বিনিয়োগ করতে হবে এবং দুই, রাজনৈতিক দল ও ট্রেড ইউনিয়নগুলি এই একটি বিষয়ে একমত হবে হবেন যে, তারা কেউ এই মনোভাব সহ্য করবেন না।

সরকারের পক্ষে এ এক দুঃসাধ্য কাজ, যার নেতৃত্ব এই ব্যাপারে মেহনতী হয়েছে যে বেতন বৃদ্ধি এবং এমন কি পুলিশ বাহিনীকেও ট্রেড ইউনিয়ন অধিকার দানেও কাজ করার মানসিকতা সৃষ্টি হয়নি তথা কুনীতির ঢেউ রোধ করা যায়নি।

বলা হচ্ছে মার্কসবাদী সোঃ্যামী থেকে বেরিয়ে এসে সি পি আই (এম) বাস্তববাদী অথবা সংস্কারপন্থী হয়েছে। এরা বলছে যে, বহু-জাতিকদের বৃহৎভাবে বিনিয়োগে তাদের আপত্তি নেই, বিশেষত যখন দেশের অন্যান্য অংশে তাদের বিনিয়োগ করতে দেওয়া হচ্ছে। বিশ্বব্যাঙ্ক ও অন্যান্য থেকে বার্ষিক হারে সাহায্য চাওয়া হচ্ছে। মুখ্যমন্ত্রী সম্প্রতি আমেরিকা ও ব্রিটেন গিয়েছিলেন এই উদ্দেশ্য নিয়ে।

বিনিয়োগকারীদের আর এক পরিকল্পনা হল, শিল্পপতিদের সমস্ত রকম সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দান, যদিও বামপন্থী কর্মীদের একাংশ একে "শিল্প-পতিদের তোষামোদ" বলে চিহ্নিত করছেন। শিল্পপতিরা স্বীকার করেন অন্তত একথা, যে পশ্চিমবঙ্গে শিল্পে শ্রমিক-মালিক সম্পর্ক সর্বক্ষেত্রে ভাল যেখানে সি আই টি ইউ এবং এ আই টি ইউ সির সঙ্গে বোঝাপড়া করা অনেক সোজা। আই এন টি ইউ সির থেকে, কারণ এই প্রতিষ্ঠান বিভিন্ন গোষ্ঠীতে বিভক্ত। কিন্তু বেসরকারী মালিকানায় সংস্থা বিনিয়োগে পরাজ্ব নয়, এর কারণ অন্যরাই বলতে পারে।

বামফ্রন্টের অন্তর্ভুক্ত দলগুলি ছাড়া অন্যান্যদের অবস্থা লক্ষ্য করলে দেখা যায়, কংগ্রেস সাম্প্রতিক নির্বাচনে অবস্থার উন্নতি ঘটাতে পারলেও শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর প্রতিকল্পিত গোছের আলোকিত, কিন্তু উপদলীয় কোন্দলে জর্জরিত। শ্রীমতী গান্ধীর হস্তক্ষেপে ঐক্যের একটা চেহারা আসতে পারে, কিন্তু ভিতরে ভিতরে অসন্তোষ থেকেই যাবে। জনতা ও বি জে পির এখানে কোন ভিত্তিই নেই আর সংকল্পের অবস্থাও তথৈবচ।

এর বিপরীতে বামফ্রন্ট এক ঐক্যবদ্ধ শক্তি, শরিকদের মধ্যে কিছু টানাপোড়েন থাকে। এবং এইভাবেই চলবে, আর কিছুর জন্য না হোক, নিজেদের অস্তিত্ব, ক্ষমতায় থাকলে বা ভালভাবে টিকে থাকার জন্য।

# সুন্দরী চিত্রতারকা দেবশ্রী রায়ের সুকোমল তনুলাবণ্যের চাবিকাঠি

"স্যুটিং বা অভিনয়ের প্রয়োজন আমাকে প্রচুর সময় বাইরে কাটাতে হয়। তাই আমি রূপচর্চার সময় পাই খুবই কম। কিন্তু তিলুজ বাক্সারী ট্যালকম পাউডার আমার সব সমস্যা দূর করে দিয়েছে।

প্রচণ্ড গরম, ঘর্মাক্ত ওমোট ঘরম, সব অবস্থাতেই তিলুজ আমাকে রাখে ঝরঝরে তাজা এবং ত্বকে এনে দেয় এক শিশির ভেজা স্নিগ্ধতার পরশ— সারাদিন।

আপনিও ব্যবহার করে দেখুন না! মনে হবে, তিলুজ একান্তই আপনার।"

—— দেবশ্রী রায়

তিলুজ
বাক্সারী ট্যালকম্ পাউডার

ইণ্ডিয়ান পারফিউমারস -এর একটি উৎকৃষ্ট উৎপাদন, কলিকাতা


সম্পাদক—হীরেন বসু। সম্পাদক কর্তৃক বি. আই. প্রি. ই. প্রেস, ২৭বি, লোয়ার সরকুলার রোড, কলিকাতা-১৩ থে
মুদ্রিত এবং ৮৭/৭ কর্নওয়ালিস ষ্ট্রীট থেকে প্রকাশিত